দ্বিতীয় জন্ম

অসীম রায়

বাক্

৩৩ কলেজ রো কলিকাতা ৯

॥ প্রচ্ছদ : যামিনী রায় ॥

বাকি

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক : তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়
৩৩ কলেজ রো কলিকাতা ৯
মুদ্রক : ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১ বাদুড়বাগান স্ট্রীট কলিকাতা ৯

মূল্য তিন টাকা

বিষ্ণু দে-কে

দ্বিতীয় খণ্ড

তহবিল তছরুপের অভিযোগে বাবা যখন জেলখানার দরজায় পা দিতে গিয়ে একটুর জন্যে বেঁচে গেলেন তখন লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। সে সময় ইস্কুলের ম্যাগাজিনে আমার কবিতা বেরোচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' পড়ছি। আর কল্পনাশক্তিতে আমি বাল্যকালে প্রচণ্ডই ছিলাম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর আমার বাবার মধ্যে কি উদ্দেশ্যে একটা মনে মনে তুলনা করেছিলাম তা ভেবে আজ হাসি পায়। এখন আমি আমার বাবাকে শ্রদ্ধা করি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী।

বাবা ছিলেন ডাক্তার। অবশ্য ডাক্তারি বাদ দিয়ে আর সবই করেছেন জীবনে অথবা বলা যায় খুব মন দিয়ে ডাক্তারি করেন নি। তাঁর মন ছিল অন্যদিকে। যেবার কাঠের ব্যবসা করার জন্যে সমস্ত পরিবার সুদ্ধ আসামে গেলেন সে দুবছর আমরা বেশীর ভাগ দিন কচু-ভাত খেয়েছি, ঠাণ্ডায় কেঁপেছি শীতের কাপড়ের অভাবে। ছোট বোনটা তো ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে নিউমোনিয়াতেই মরল সেখানে। সেখান থেকে ফিরে আরও অনেক কিছু করেছিলেন। একটা চা বাগানের ম্যানেজারও বোধহয় হয়েছিলেন একবার। তারপর কলকাতায় ফিরে ঠিক যুদ্ধের মুখেই ওষুধের ব্যবসা শুরু করলেন। আমি যখন কলেজে ঢুকি তখন আমাদের ভয়ানক টানাটানির সংসার, ভাতের ওপর শুধু ডাল আর একটা লাবড়া খেয়ে কলেজ ছুটেছি। আর যখন কলেজ থেকে বের হলাম (অবশ্য শেষ পরীক্ষাটা আর দেওয়া

দরকার মনে করি নি) তখন আমি একজন ক্ষুদে যুবরাজ। শেষের কয়েক মাস বাবা যে নতুন কালো রঙের ব্যুইক গাড়িখানা কিনে ছিলেন তাই নিজে হাঁকিয়ে কলেজ যেতাম।

সে গাড়িও বিক্রি হয়ে গেছে গত কয়েক বছরের মধ্যে। কিন্তু এই কবছরে আমাদের অবস্থাটা একটু গুছিয়ে নেওয়া গেছে। একখানা দোতলা বাড়ি কিনেছেন বাবা কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। এক সৌখিন মুসলমান ভদ্রলোকের সাজানো বাড়িখানা বেশ সুবিধে দরেই কিনে নিয়ে নিচু তলা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। আর আমায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন এক বিলিতি ওষুধের কোম্পানিতে।

কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে গত কয়েকবছর বিজনেস মহলে ঘোরাফেরা করে আমায় বাবার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে। কলেজে যখন সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিষয়ে মোটা মোটা বই পড়ে নিজেকে ভয়ানক প্রাজ্ঞ মনে হত তখন বাবা টের পেতেন আমার মনের কথা। আমি যে তাঁকে এক নিঃশব্দ অশ্রদ্ধায় অভিষিক্ত করে যাচ্ছি তা বুঝেও তিনি কিন্তু ছেলের কাছ থেকে কোন দিন সম্মান ভিক্ষা করেন নি প্রকারান্তরেও। আমি তখন বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বক্তৃতা করতাম যে মানুষের যদি উপযুক্ত শিক্ষা থাকে তাহলে টাকা উপায় করা ছাড়াও অন্য চিন্তা মাথায় থাকে। বাবার মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ আমি অন্যভাবেও করেছি। বাবা কোন দিন উত্তর দেন নি, সামান্য বিচলিত বোধ করেন নি। এখন তাঁর অনমনীয় ভাবের কিছুটা তল পাই। কলেজে আমরা যা শিখি তার যে খুব একটা দাম নেই আসল জীবনের ক্ষেত্রে এবং একমাত্র তার দাম হতে পারে আরও কতক-গুলো মালমশলা জোগাড় করতে পারলে একথা এখন হাড়ে হাড়ে টের

পাই। আর এই বোধ জাগার সময় থেকেই আমি বাবার সঙ্গে একট নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করতে শুরু করেছি।

তবে বাবার সবটাতেই একটা ঠাট্টার ঢং ছিল। তিনি এ জীবনযুদ্ধে অনেকবার হেরেও সত্যি করে হারেন নি -একথা তাঁর চেহারায় কথাবার্তায় কি করে টিকিয়ে রাখতেন ভেবে অবাক হতাম। কারণ যখন তিনি পয়সাকে খুব বড় জিনিষ বলে আমার সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করতেন তখনও মনে হত লোকটা পুরোপুরি তার নিজের কথা বিশ্বাস করে না। পয়সা তিনি প্রচুর রোজগার করেছিলেন কিন্তু পয়সা তাঁকে বাঁধতে পারে নি। বরং আমায় পেরেছে। পয়সার চাপ তাঁকে এক তিল ক্লান্ত করতে পারে নি। কিন্তু আমার তিরিশটা বছর পার হবার আগেই টাকার এই ভোজবাজি জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কেতাবের জগতে যেমন টাকার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতাম কেতাবের বাইরে এসে তেমনি টাকা যে সমগ্র ছায়া ফেলে আমাদের জীবনে সেই ছায়ার সান্নিধ্যে অনেকখানি হিসেবী হয়ে পড়েছি। বাবা কেন হলেন না সে ম্যাজিকটা এখনও ঠিক ধরতে পারি নি।

আমি ভেবে দেখেছি শুধু বাণিজ্য কেন, বন্ধুত্বে, ভালবাসায়, পারিবারিক জীবনে, অফিসে, পথ চলতে, চায়ের দোকানে, পাড়ার যেখানেই যাই সেখানেই টাকার সেই বিশাল ছায়ায় ঘোরাফেরা করছে মানুষ। এ ধারণাটা একদিনে হয় নি, আস্তে আস্তে হয়েছে কলেজ-পরবর্তী অফিসের জীবনে। এক এক বার মনে হয়েছে হয়তো আমি ভুল করছি। অন্তত কলেজে পড়া বাইরের জগতের সঙ্গে চারপাশের

জগতের কিছুটা মিল থাকবে তো! এরকম মিল যে জোর করে খাড়া করি নি তা নয়। কিন্তু তারপরই দেখেছি সে মিল দাঁড়ায় নি। তা বলে আমি আবার তিতো, বীতশ্রদ্ধ হয়েও যাই নি। কারণ তিতো বীতশ্রদ্ধ হবার মধ্যে একটা শক্তির অপচয় আছে। আমার তাও সহ্য হয় না। আমি মেনে নিয়েছি মানুষকে। তার অবস্থা এমনি বেকায়দা-জনক যে সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে তাকে স্থান দিয়েছি। এই টাকার ছায়ায় মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব যখন লালিত হচ্ছে তখন তার অস্তিত্ব নিয়েই কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আমি করি না।

কারণ করে কি লাভ যখন তার উত্তর আমি দিতে পারব না? আর জীবনটাকে প্রশ্নের পর্যায়ে রাখার যে কষ্ট তা বইবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি বেশ স্থিরভাবে ভেবে দেখেছি। তবে আমার আর একটা দিক আছে সেটা একটু অদ্ভুত লাগলেও খুব সত্যি। কলেজ জীবনে আমি একটা বেয়াড়া ধরণের কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটা পরে বুঝেছিলাম কিছু হয় নি কিন্তু সে কবিতার এক লাইনের সঙ্গে আমার চরিত্রের মিল আছে। এখনও সে লাইনেব তাৎপর্য আমার জীবনের ক্ষেত্রে একেবারে অস্পষ্ট নয়। ঠিক মনে নেই, কিন্তু লাইনটার মানে করলে দাঁড়ায়, লেখকের মতে হ্যামলেট জাতীয় চরিত্র থেকে ডন কুইক্সোট জাতীয় চরিত্র ঢের ভালো।

এখন এরকম লেখা আমার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য। তখনও কি করে মাথায় এসেছিল লাইনটা ভগবান জানেন, বোধহয় কোন ইংরেজী লেখা থেকে। এখন মাথা ধরলে আমাদের কোম্পানির ওষুধ কেন একেবারে অব্যর্থ তার বিজ্ঞাপন নিখুঁতভাবে লিখতে পারি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ডনকুইক্সোট-প্রীতি একেবারে গিয়েছে তা নয়। যদিও আমি নিজের মধ্যে কোন দিন মুহূর্তের জন্যেও সেই স্পেনদেশীয়

ভদ্রলোকের কোন ক্ষীণ অস্পষ্ট উপস্থিতিও অনুভব করি নি কিন্তু আমার মনে হয়েছিল অন্তত ইতিহাস পড়তে গিয়ে কিংবা মানুষের জীবনের দিকে তাকিয়ে—যেখানেই অন্ধকারে গান গাওয়া হয়, পাথরে ফুল ফোটে সেখানেই একটা ডন কুইক্সোট দাঁড়িয়ে আছে। আমি এক নতুন ডন কুইক্সোটের উপস্থিতি কল্পনা করে শিহরিত হতাম। যে লোক এই চারদিকের বিরাট টাকার দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করবে, চীৎকার করবে, তার পরিণতি কি হবে তা খুব নিশ্চিতভাবেই জানি। তাকে যে একেবারে টাল খেয়ে পড়তে হবে মাটির ওপর সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই স্পর্ধিত চ্যালেঞ্জের কথা চিন্তা করে আমি অভিভূত হতাম। সেই ডন সাহেবের ভগবানের মতো স্পর্ধায় কেউ যদি হাঁক দিয়ে এই টাকার দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত আর ঝাঁপিয়ে পড়ে খান খান হয়ে যেত তাহলে আমি আমার চারদিকের দেয়ালতোলা হিসেবের জগতের বাইরে এসে সেই বীরকে সেলাম করতাম। ঠিক এই জন্যেই আমার বাবার প্রতি আমার এক ধরণের শ্রদ্ধা লুকানো আছে।

আমি অবশ্য নিজের জীবনের ছকটা একেবারে বেঁধে ফেলেছি। তার কোন নড়চড় নেই, সেখানে ডন কুইক্সোট হবার তিলমাত্র সম্ভবনা নেই। কিন্তু আমার জীবনের বাইরে আমি সে ছবি দেখতে চাই। উপমা বাদ দিলে সিধে কথায় বলব, আমার কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে আমি আপস্ করে নিয়েছি, কিন্তু অন্যের মধ্যে স্পর্ধা দেখবার বাসনা আমার আজও প্রবল। আর এই স্পর্ধার ব্যাপারটা সব সময় প্রত্যক্ষভাবে টাকার সঙ্গেই জড়ানো তা নয়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমি দুটো লোক-কে নিঃশব্দে আর্থিক সাহায্য করে এসেছি।

একজন আমার দূর সম্পর্কের দিদি আর অন্যজন আমার ইস্কুলের সহপাঠী। জামাইবাবুটির সঙ্গে আমার দিদির সামান্য মিলও ছিল না, কোনরকমে জুড়ে ছিলেন। শেষে আর থাকতে না পেরে আলাদা হয়ে তেজের সঙ্গে সিঁদুর মুছে ফেললেন সিঁথি থেকে। এ অবস্থায় আমি তাঁকে কয়েক বছর আর্থিক সাহায্য করেছিলাম। ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখবার জন্যে এক তীব্র আগ্রহ ছিল। শেষ পর্যন্ত বি. এ. এম. এ. পাশ করা মহিলামহলও তাঁকে এত খোঁটা দিতে আরম্ভ করল যে থাকতে না পেরে আবার তাঁকে পতিগৃহে ফিরে যেতে হয়। এখন তাঁরা সুখী, তবে তাঁর ফিরে যাওয়ার পর থেকে আমি তাঁকে ভুলে গিয়েছি।

আমার গরীব মেধাবী বন্ধুটির বরাবর ঝোঁক কলেজ থেকে বেরিয়ে রিসার্চ করার। আমি তাকে বলি কলেজ থেকে বেরিয়ে ট্যুইশানি করে আর আমি যা দিচ্ছি তাই দিয়ে কয়েক বছর কাটিয়ে দিতে। আমার কথামতো টাকা দিতে কার্পণ্য করি নি। বছরদেড়েক বেশ চলেও ছিল। তারপর একদিন আমার কাছে এসে সহানুভূতি কাড়ার ভঙ্গীতে সে বলেছিল যে মার জন্যে তাকে শেষ পর্যন্ত চাকরি নিতে হল। সেদিন থেকে তার সঙ্গে আমি কোন সংস্পর্শ রাখি নি।

বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধার কারণের মূল কথা হল তাঁর সেই বেপরোয়া ভাব, তাঁর স্পর্ধা। জীবনের শেষের দিক বাদ দিলে সমস্ত বছরগুলো ধরেই তিনি নতুন নতুন ঝুঁকি নিয়েছেন। এখন আর নেন না। নিলে আবার আমরা ফতুর হতাম, আবার সেই কচু-ভাতের জীবনে নামতে হত। এদিক থেকে আমি তাঁর বুদ্ধির তারিফ করি। তিনি না থাকলে আমার এমন নিশ্চিত ভবিষ্যৎও সম্ভব হত

না। এখন আমার আর নতুন করে কিছু ভাববার নেই। তিনিই সব ভেবে রেখেছেন আমার জন্যে। তিনি আমার সামনে একটা স্থির রাজপথ মেলে ধরেছেন যে পথে মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত আমি অবধারিতভাবে হেঁটে যাব। এজন্যে তাঁকে বারবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু মনের একটা দিক শূন্য হয়ে থাকে। সেখানে আমার বেপরোয়া বাপ এখনও রাজত্ব করে, এখনও তাঁকে আসামের জঙ্গলে দেখি, ডুয়ার্সের পাহাড়ে দেখি। সে ছবি আমি কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারি না।

আর কিছুদিন হল আর একটা মানুষও আমার মন জুড়ে আছে। তার নাম সুনীল, তাকে সবাই ডাকে সোনা বলে।

সোনার সঙ্গে নতুন করে দেখা হল এক গানের আসরে।

ছেলেবেলায় এস্রাজ শিখেছিলাম, কয়েকটা মামুলী গৎ আর কিছু গান বাজাতে পারতাম। এছাড়া সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ নেই। ছেলেবেলা থেকে যে শিক্ষার ফলে আশোয়ারী আর জৌনপুরীর পার্থক্য ধরা পড়ে কানে সে শিক্ষা আমার ছিল না। তা সত্ত্বেও সারারাত জেগে গানের জলসায় গিয়েছিলাম। তার প্রধান কারণ কয়েকদিন রাত্তিরে ঘুম হচ্ছিল না। তার ওপর একটা টিকিটও পেয়ে গেলাম মাগনায়। কাগজে দেখলাম ভারতবিখ্যাত গায়কগায়িকারা সব আসছেন। ভাবলাম, ভাল না লাগুক অন্তত লোকের সামনে তো এটুকু বলা যাবে যে অমুক বাই-এর গান আমিও শুনেছি।

গিয়ে অবশ্য একটু মুস্কিলেই পড়লাম। চারপাশেই দেখি সমঝদার লোক। তারা সবাই তারিফ করছে মাথা নেড়ে, বাহবা দিচ্ছে উচ্চ স্বরে। জনৈক গায়িকা যখন তাঁর তান বিস্তার করছিলেন তখন পাচ্চ

থেকে একজন দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত গলায় কি বললে। আর গানের মেজাজে এমন একটা পরস্পর বন্ধুত্বের আমেজ তৈরি হল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই নিচু গলায় এমনভাবে আলাপ শুরু করল যে আমার মনে হল এরা সবাই এক বিরাট রহস্যের অংশীদার আর আমি যে তাদের বাইরে তারা তা টের পেয়ে গিয়েছে। শিল্পী যত উঁচুদরের বন্ধুত্বের আবহাওয়া তত ঘনীভূত হল, টুকরো টুকরো মন্তব্যের সংখ্যা আরও বাড়ল। একবার মরিয়া হয়ে একটা মন্তব্য করে বসলাম। তারপরই দেখি এক ভদ্রলোক আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন। আমি একেবারে চুপসে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাত্তির বাড়তে না বাড়তে আমিও জমে গেলাম। তার মানে এ নয় যে আশোয়ারী আর জৌনপুরীর পার্থক্যটা এবার বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আলাপ, তানের বিস্তার এমন কি গলার খুচরো কাজও ধীরে ধীরে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করল। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার সম্মোহনের কারণ কি। প্রথম দিকে গায়কেরা গানের ব্যাকরণ ছাপিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু পরের দিকে ব্যাকরণ ছাপিয়ে গায়কের গলা এসে আমার কানে মনে আঘাত করতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল অতি ধীরে ধীরে এক অপরিচিত ঐশ্বর্য পাঁপড়ি মেলছে আমার সামনে। এক ওস্তাদের চেহারা আমায় আকৃষ্ট করল অতিমাত্রায়। ভয়ানক কুৎসিত চেহারা, আমরা যাকে বলি হতকুচ্ছিৎ ঠিক সেই রকম। কালো ধুমসো তিন-মনি চেহারা, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, একগুছি লাল চুল ছাড়া মাথার সবটাই টাক, গালের ওপর আবার একটা আব। শেরোয়ানীতে আঁটা বিরাট ভারী শরীরখানা টানতে টানতে যখন স্টেজে গিয়ে লোকটা উঠল তখন স্তম্ভিত হয়েছিলাম। কিন্তু আলাপ শুরু হবার পর থেকেই

তার চেহারা পাল্টে গেল আমার চোখের সামনে। তখন মনে হল এ চেহারা ছাড়া আর কোন চেহারা থেকে এ গান বেরোতে পারে না। তানের ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে যখন তার মোটা বেঁটে হাত দুটো উঠতে নামতে লাগল তখনও আমার কাছে তা দৃষ্টিকটু ঠেকল না। তার গলায় এমন কি ছিল যা আমি আমার এস্রাজ বাজানোর গতে পাই নি, চলতি রেকর্ডে শুনি নি। তার প্রত্যেকটা স্বর সামান্য টোল খায় না। পরিষ্কার ঝকঝকে মাজা আবার পরমুহূর্তেই গম্ভীর ভরাট। তার সা যেন আর একটা সা। তার মা যেন আগে শুনি নি কখনও। এমন কি তার স্বর শুনে মনে হচ্ছিল যে সারগম ছাড়াও তার গলায় আর একটা কি আছে যা এই কড়িকোমলের জগত ছাপিয়েও বিরাজ করছে। গানের এই বিশেষ স্বকীয়তা আমি এর আগে কখনও শুনি নি। মনে হল ঘণ্টার পাখা গজিয়েছে। পাশে যারা বসে আছে তারা আমায় কি ভাবছে তা আমার মন থেকে অনেকক্ষণ সরে গিয়েছে। সেই লোক-ভর্তি হলঘরে যে গাইছে আর আমি এ দুজনই লোক ছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে গানের পরিবেশও আমায় আকৃষ্ট করল। যে লোকটা হারমোনিয়মে সঙ্গত করছিল তাব চেহারা ঠিক খুনীর মতো। ছুঁচলো কাঁচাপাকা চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তার যন্ত্র থেকে ছলকে ছলকে উঠছে এক একটি তীক্ষ্ণ মর্মভেদী স্বর। এই বৈপরীত্য আমায় অবাক করল। রাস্তা দিয়ে এই লোকটা তার বাদামী কোট আর কম্ফাটার পরে যদি হেঁটে যেত কিংবা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনত তাহলে কি কখনও ভাবতে পারতাম যে এ লোকটার মনে এমন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার লুকানো আছে।

রাত তিনটে নাগাদ আমার তন্দ্রা এল। আর একভাবে থাকতে থাকতে কেমন অসোয়াস্তিও লাগছিল। ভাবলাম বাড়ি চলে যাই। তারপর ভেবে দেখলাম বাড়ি যাবই বা কি করে। ট্রাম বাস চলতে এখনও ঢের দেরি। তবু বাইরে একটু ঘুরে আসব ভেবে উসখুস করছি এমন সময় পাশ থেকে একটা ভারী গলা ভেসে এল, "ভাল সেতার আছে, এখন যাবেন না।"

আমি পাশ ফিরে বক্তার দিকে তাকালাম প্রথমে চিনতে পারি নি, অথচ মনে হল চেনা চেনা। কালো চওড়া চেহারা। আমার চেয়ে লম্বাও হবে, পাশে বসেই মালুম হচ্ছিল। মাথাটা একটু বেমানান বড়, মোটা নাক, চোখের চাউনিতে অসাধারণ কিছু নেই বরং চোখ ছোটই। তবে তার হাসিটা আমার খুব চেনা ঠেকল। বি, এ, পড়বার সময় একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে অনার্স ক্লাসে কিছু-দিন পড়ে উধাও হয়েছিল। খুব ফড়ফড় করে ইংরেজী বলত, মোটা চুরুট খেত ক্লাসের বাইরে। একমাত্র তার হাসিটা আর চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে কথা বলার ঢং এখনও ভুলে যাই নি। সে নিজেই বললে, "আমার নাম সুনীল···সোনা, আপনার সঙ্গে দেড়মাস পড়েছিলাম কলেজে···"

আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন আছেন?"

ছেলেটি সামনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, "আগে বাজনাটা শোনা যাক, বাইরে গিয়ে আলাপ করব।"

আলাপ শুরু হল কানাড়ায়। সুর লেখা ছিল মঞ্চের উপর কালো বোর্ডে। একটু কষ্ট করেই পড়ে নিলাম পাছে পাশের লোকজনের কাছে বেকুব বনে যাই। কিন্তু আলাপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশের লোকের চিন্তা মন থেকে উবে গেল। আর যেমন মনে

হয়েছিল কিছুক্ষণ আগেও যে সা-টা ঠিক সা নয় ঠিক তেমনি এ সেতারের মীড়ও মনে হল আলাদা। বীণের কাজের মত এক একটি নিটোল স্বরের অশরীরি অঙ্গুরী ঘুরে ঘুরে সমস্ত হল্ ছেয়ে ফেলে আলোর ঝাড়, ছাদের আনাচে কানাচে বেড়িয়ে বেড়াতে থাকে। কখনও তাদের এক একটি একেবারে আলাদা সত্তা নিয়ে যন্ত্র থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে আসে, আবার কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তারা এ-ওর গায়ে মিশে যায়। প্রথম প্রথম আমার মনে কতগুলো অনুষঙ্গ ভেসে উঠেছিল যেমন জলে ঢেউ দিয়েছে আবার জলেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই কোন ছবিই আমার মনে জেগে রইল না। আমি যেন স্বরের পেছনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর মনে হল স্বরের বিশিষ্ট নিজস্ব এক সত্তা আছে, তা জল নয়, বাতাস নয়, আলো নয়। সেই বিশেষ সত্তাটি এই অন্ধকার হলঘরখানায় এতগুলো লোকের মাথার ওপর দিয়ে কাঁদছে হাসছে নাচছে আর আমিও তার সঙ্গে কাঁদছি হাসছি নেচে বেড়াচ্ছি।

শেষের দিকটায় অবশ্য যে রাজ্যে ছিলাম সে রাজ্য ভেঙ্গে গেল। তবলার সঙ্গে লয়ের খেলা এত ঝমঝম করে কানে বাজছিল যে স্বরের সেই বিশেষ সত্তাটি যেমনভাবে ধরা দিয়েছিল কানে তেমন ভাবে দিতে আর চাইল না। তবে লয় দ্রুততর হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যেও এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হল। হলের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু মঞ্চের ওপর আলো। পাশে ফিরে দেখলাম হলের দরজাগুলো খোলা, দরজার পাশে অগণিত মাথা আর সেই মাথাগুলোর ওপর দিয়ে একটা অদ্ভুত আলো ফুটেছে, ভোরের নীল আলো। আমি স্তব্ধ হয়ে সেই নীল আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বাইরে এসে যখন আমরা মাটির ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিচ্ছি তখন সবে ভোর হচ্ছে। রাত জাগার পর সকালের হাওয়ায় চা খেতে খেতে বেশ চাঙ্গা লাগছিল। একটা সিগারেট মুখে দিয়ে আর একটা সোনার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে হেসে মানা করল।

আমি বললাম, "কিরকম? আমি তো মশাই আপনাকে এন্তার চুরুট খেতে দেখতাম।"

"না, এখন আর খাই না, অসুখ হয়েছিল কিনা।"

"নিন নিন, আমার এই শরীরে যদি সিগারেট চলে তাহলে আপনার মত শরীরে…"

"না না, সত্যিই ডাক্তারের বারণ।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন, কি হয়েছে আপনার?"

"টি.বি. হয়েছিল। সেরে গেছে, তবে বিধিনিষেধগুলো এখনও যায় নি।"

আমি আশ্চর্য হয়ে তার বুকের চওড়া খাঁচা, তার শক্তিশালী কাঁধ আর ঘাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। যে অসুখে সে পড়েছিল তা থেকে সেরে উঠলে অনেকে একটু ফুলে যায়। কিন্তু সেরকম ফুলে ওঠার সঙ্গে তার জোয়ান চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই।

সোনা বললে, "আপনি বোধহয় অবাক হচ্ছেন। আমিও হয়েছিলাম সকলের চেয়ে বেশী। যে বছর অসুখে পড়লাম তার আগের বছর সাঁতারে দুটো কাপ পেয়েছি। পাড়ার ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন আমি।"

"তাহলে কি করে হল? একটা তো কোন কারণ থাকবে।"

"হ্যাঁ কারণ একটা ছিল। তবে সে কারণ জেনে কোন সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। পুলিশের একটা ফায়ারিংয়ের মাঝখানে পড়েছিলাম।

সেই প্রথম ছাত্রদের মিছিলে যোগ দিয়েছি। প্রথম যখন গুলিটা লাগল ঠিক বুঝতে পারি নি। গণ্ডগোল, ঠেলাঠেলি, চীৎকারের মাঝখানে সব একাকার হয়ে গেল। হাসপাতালে জেগে শুনলাম অপারেশন হয়ে গিয়েছে। ফুসফুসের গা দিয়ে নাকি গুলি বেরিয়ে গেছে। একটুর জন্যে বেঁচে গেছি।"

রাস্তায় নেমে আমরা কতক্ষণ হাঁটতে শুরু করেছি খেয়াল ছিল না। বললাম, "তারপর?"

"তারপর আর কি! সেখান থেকেই বোধ হয় সূত্রপাত। তবে সঠিক বলা যায় না।"

একটা দুটো করে ট্রাম চলতে শুরু করেছে। ভোরের তারা দপদপ করে জ্বলছে আকাশে।

সোনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "চলুন না হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাড়ির দিকে।"

আমি একবার ওপরে তাকিয়ে দেখলাম। সেই নীল ভোরের রেশটা এখনও ছড়ানো রয়েছে আকাশে। দালানগুলোর নিচে কাপড় মুড়ি দিয়ে মুটের সারি অঢেলভাবে ঘুমিয়ে, দোকানপাট বন্ধ। গত রাত্তিরের রেশ সবেমাত্র জলে ধোওয়া নির্জন চওড়া রাস্তা জুড়ে চারদিক ছড়িয়ে আছে। আর সেই চারদিকের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করলাম।

বললাম, "চলুন, আজ আমার বিশেষ তাড়া নেই। দেরিতে অফিস।"

আমরা দুজন সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ ধরে উত্তরমুখো রওনা হলাম।

দুই

সেদিন যেতে যেতে দুজনের মনের কথা চট করে বলে ফেলতে পেরেছিলাম। এভাবে বলার জন্যে আমাদের মন বোধহয় আগেই তৈরি ছিল। তাই কোন ভূমিকা করতে হয় নি।

আমি বললাম, "আচ্ছা সোনাবাবু, আপনার কি মনে হয় না…"

"বাবুটা বাদ দিন না। আমরা পরস্পর তুমি বলতে পারি অনায়াসে", সোনা হেসে বললে।

"হ্যাঁ সেটা হবে আস্তে আস্তে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে আমরা যা বলে থাকি কলেজ জীবনে তার বেশীর ভাগ মিথ্যে। আমার এই গান শুনে আরও মনে হচ্ছে। রাত্তিরে যা শুনলাম তার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই।"

সোনা আমার দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে বললে, "একথা কেন বলছেন?"

"ভাববেন না গান শুনে খুব অস্থির হয়ে বলছি। কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পরই এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে।"

"সব সময় নিজের জীবন থেকে বিচার করলে কি ঠিক উত্তর মেলে?"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "নিজের জীবন কেন, অন্যের জীবনের দিকেও তো তাকিয়ে আছি। আমি বলতে চাই ছেলেবেলা থেকে যদি আমরা শিখি—যেমন মনে করুন মারোয়াড়ীর গদিতে শেখানো

হয় যে টাকা রোজগার করে খেয়ে পরে থাকলেই আর কিছু ভাববার নেই—তাহলে আমাদের জীবনের দুঃখবোধটা অনেক কমে যায়।”

সোনা বললে, “তা মন্দ কি! অসাধারণ হবার কি দরকার। আমার চারিদিকে যদি অসাধারণ লোক পিল পিল করে ঘুরে বেড়াতো তাহলে দমবন্ধ হয়ে মারা যেতাম। আপনি বললেন মারোয়াড়ীদের কথা। আমি বলব আমার গাঁয়ের লোকজনের কথা। কোন রোমান্স নেই তাদের জীবনে। ভয়ানক কষ্ট, দারিদ্র্য সবই আছে। মারোয়াড়ীরা আপনার বুকে চেপে বসে আছে আর আমি চোখ বন্ধ করলেই আমার চোখের সামনে ভাসে অন্য লোকজন।”

“আপনার দেশ কোথায়?”

“দেশ আমার পাকিস্থানে—পাবনায়। এখনো যাতায়াত আছে। মনে করুন জামাল বলে যে লোকটা আমাদের বাড়ি দুধ দিত—একবার দাদামণি নিউমোনিয়া থেকে উঠলে সারামাস দুধ দিয়ে এক পয়সা নেয় নি—সে লোকটা গত বছর আমি এসেছি শুনে তিন ক্রোশ পথ ভেঙ্গে তার নতুন বাড়ি থেকে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আর যদ্দিন ছিলাম তদ্দিন এই তিন ক্রোশ পথ ভেঙ্গে আমাকে সে দুধ খাইয়ে গিয়েছে। আপনি জামালকে গাল দিন বোকা বলে কিংবা সহৃদয় মানুষ বলে আকাশে তুলুন, সে তোয়াক্কাও করে না। তার এই মনুষ্যত্বকে আপনি দাম দেবেন না?”

আমি বিদ্রূপ করে বললাম, “তবু তো আপনি আর আপনার জামাল দেশভাগটা ঠেকাতে পারল না।”

“তাতে কি হয়েছে?”

“তার মানেই আপনাদের মনুষ্যত্ব বলে বস্তুটা খুব জোরালো কিছু নয়। ওরকম যাকে বলে গলিত নখদন্ত মনুষ্যত্ব, ওতে কি এসে যায়?

কলেজে থাকতে ভাবতাম ও বস্তুটার খুব দাম আছে। এখনও বাইরে বলি লোকজনের সামনে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একেবারে মানি না। মনুষ্যত্বের চেয়েও আরও একটা বড় জিনিষ আছে, সেটাই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।"

"সেটা কী?"

"সেটা কী আমি ঠিক বলতে পারব না। যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তারা বলে ভগবান। আমি সে সান্ত্বনা পাই না, চাইও না। আমি একেবারে নিশ্চিত করে বলতে পারব না বস্তুটা কী। কিন্তু আর যাই হোক মনুষ্যত্ব নয়। সেটা ক্ষমতা কিংবা টাকা, অথবা কোন সংঘ…"

সোনা জোর দিয়ে বললে, "সেটা ক্ষমতাই হোক, টাকাই হোক অথবা কোন সংঘই হোক, তার মূলে সেই মনুষ্যত্ব। তা বাদ দিলে মানুষের সমস্ত ইতিহাসই একটা পেতনীর নাচ মনে হবে।"

"তা মনে হলে আর কি করা যাবে?"

"কিছুই করা যাবে না। একটা মিথ্যে কথা খুব চাবকিয়ে বলা হবে, এই আর কি! এ রকম মিথ্যে আগেও বহুবার বলা হয়েছে। তাতে কিছুই এসে যায় না।"

আমি এবার নিজের বিরক্তি ঢাকবার চেষ্টা না করেই বললাম, "কিছুতেই কিছু এসে যায় না।"

সোনাকে উত্তেজিত দেখাল। সে তার ভারী গলা চড়িয়ে যখন আমায় তার বক্তব্য বোঝাচ্ছিল তখন আমি তার বক্তব্যের চেয়েও তাকেই লক্ষ্য করছিলাম বেশী। সোনা বললে, "এসে যায়, এসে যায়। আপনার না ভালো লাগতে পারে, আপনি তিতো হয়ে যেতে পারেন। শুধু তাতেই কিছু এসে যায় না।"

আমি বললাম, "দেখছি আপনার কলেজের ঘোর এখনও কাটে নি।"

"না কাটে নি, আর কাটবেও না। কলেজ জীবনের জন্যে আমার লজ্জা নেই, অকারণ গৌরবও নেই।······আপনার সঙ্গে আমার এতক্ষণ কথা হল অথচ কি আশ্চর্য আমার নিজের কথাটাই বলা হল না। আমার সমস্যাটা কিন্তু আপনার মতো না। সেটা আরও গোড়ার কথা।"

"কি রকম?"

"আমার খালি একটাই সমস্যা, একটাই দুঃখ। কোন ছেঁদা নেই এমনি আস্ত তাজা ফুসফুস যদি আমার থাকত। মানে নেহাত বাঁচা, এখানে আর কোনও কথা নেই।"

"কিন্তু তারপরও তো······"

"না না, কোনও কিন্তু কোনও তারপর নেই। আমাদের পাড়ার মদনা সারা সকাল সাঁতার দিয়ে দুপুরে মড়ার মতো ঘুমিয়ে বিকেল হতেই ঘাড়ে পাউডার মেখে পাড়ার ঝিদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়। আমি সেই মদনাটাকে হিংসে করি। আর আমাদের পার্কেই পানুদা-কে রোজ দেখবেন। দাঙ্গার পর থেকে লোকটা পাগল হয়ে গেছে। রোজ সকালে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার ফাটা ফুসফুস নিয়ে আমি পানুদার দিকে তাকাই—আর বিশ্বেস করবেন না আমার হিংসে হয়।······আমি তখন পড়ি ক্লাস ফাইভে। 'আগ্‌লি' কথাটা দিয়ে মাষ্টার বাক্য রচনা করতে দিয়েছেন। আমরা লিখেছি, "এ্যাস ইজ্‌ আগ্‌লি", "মাউস ইজ্‌ আগ্‌লি।" একটি ছেলে লিখেছিল, "সোনা ইজ্‌ আগ্‌লি!" মাষ্টার খুব মারলেন ছেলেটিকে। আরও পরে যখন সংস্কৃত ক্লাসে পড়লাম,

"কন্যা বরয়তি রূপম্", ছুটে গিয়ে মাষ্টারকে বললাম, "এর মানে কি স্যার?" মাষ্টার খুব ভালবাসতেন আমায়। মানে শোনার পর যখন আমার চুল-ওঠা মাথাটা নেড়ে বিহ্বলভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে স্যার··· ··" তিনি হেসে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, "দূর! তা কি সব সময় হয়।"

আমার হঠাৎ মনে হল সোনা আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে। বললাম, "কিন্তু আপনি নিশ্চয় ভালো লোক মানে সুন্দর চেহারা ভাবেন না। বাঁচার কষ্ট বুঝতে পারি ভালমানুষের অভাবে কিন্তু সুন্দর চেহাবার জন্যে···"

সোনা আমার কথার মাঝখানেই ঠাট্টা করল কিনা বুঝলাম না। বললে, "দেখুন। আপনার মত চেহারা হলেও না হয় চলত। কিন্তু এই বুলডগের মতো চেহারা। কুৎকুতে চোখ আর খোঁচাখোঁচা চুল নিয়ে কোথায় দাঁড়াই বলুন তো? আপনি বলবেন, সক্রেটিস দেখতে আসলে সুন্দর ছিল। ওসব তত্ত্ব আমি জানি। কিন্তু যে সব মেয়েদের সঙ্গে আমার ভাব তারা তো তা বুঝবে না। আমি সাধারণ মেয়েদের সঙ্গেই মিশি যারা সাদাকে সাদা বলেই খালাস। সন্দেশে মিষ্টি না পেলে তারা চেঁচাবেই।"

"কেন মেশেন?"

"প্লিস্, আমি মহাপুরুষ নই। দেরাজে আমার সাঁতারের কাপ-গুলো দেখি আর ভাবি ঠিক আগের মতো মিত্তিরদের পাঁচিলতোলা পুকুরে যেখানে জুঁইয়ের ঝাড় নেমেছে সেখানে ডুব দিয়ে হাঁসের সারির পাশে যদি আবার ভেসে উঠতে পারতাম। ওভার বাউণ্ডারি করব ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। আর পাড়ার থিয়েটারে রিহার্সেল, এখনকার মতো উঁচু গলায় কথা বলার ওপর ট্যাক্স বসবে না,

বেলা-কে নিয়ে মাঠে বেড়ানো—নাঃ, বাঁচার ইচ্ছেটা আমার বড্ড বেয়াড়া।”

আমার কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, “বেলা কে ?”

“বেলা আবার কে, একটা মেয়ে। আমার দিকে খুব ঝুঁকেছিল। তবে অসুখটা হবার পর থেকেই কেমন যেন……অবশ্য খুবই স্বাভাবিক।”

আমরা যখন সোনাদের পাড়ায় এসে পৌছলাম তখন গড়পারের দিক থেকে সূর্যের আলো সোনাদের গলিতে এসে পড়েছে। গলি পেরোলেই ছোট পার্ক। তার কোণে একটা কিম্ভূৎকিমাকার মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই চম্‌কে উঠলাম। সোনার পানু-দা না কি ! কোমরে একটুকরো কাপড় লেগে আছে মাত্র। আকাশের দিকে আঙ্গুলগুলো বাড়িয়ে কি বিড়বিড় করে বকছে। হঠাৎ আমাদের দিকে তার চোখ পড়ল। একমুখ খোঁচাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ির ভিতর থেকে একজোড়া ভাষাহীন চোখ আমাদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল পানু-দা, “সোনা সোনা, শোন।”

সোনা এগিয়ে গিয়ে বললে, “কি পানু-দা ?”

“আমায় খাওয়াবি না সোনা ?”

“হ্যাঁ খাওয়াব। তুমি এসো না আমাদের বাড়ি একদিন।”

পানুদা সোনার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললে, “ইলিশ মাছের ঝাল করবি একটা আর···তোব মা আমায় তাড়িয়ে দেবে না তো ?”

“না না, কেউ তাডাবে না। তুমি একদিন এসো পানুদা। তোমার জন্যে আমি নিজে মাছ আনব।”

পানুদার বোধহয় সোনার কথাগুলো কানে ঢুকল না। এগিয়ে

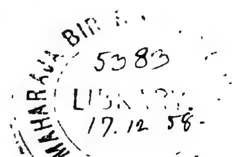
গিয়ে আমাদের দিকে উল্টোমুখ হয়ে হাতদুটো শূন্যে মেলে আগে যেমন বকছিল তেমনি বকতে থাকে সে।

তাকিয়ে দেখলাম, চারদিকেই বাড়ি থাকায় ছোট পার্কটা ঠিক উঠোনের মতো। একটা দুটো দরজা জানালা ছাড়া আর সবই বন্ধ। তাদেরই মধ্যে একটা রং-ওঠা বন্ধ দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সোনা বললে, "এইটে আমাদের বাড়ি। আসুন না।"

"আজ থাক আর একদিন আসব।"

পরদিন সোনার মা-কে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। একটা প্রচণ্ড ক্ষয়ের ছাপ সমস্ত চেহারা জুড়ে। যেন গত পঞ্চাশ বছর তিনি ধুঁইয়েছেন। আর আগুন নয় শুধু ধোঁয়া তাঁর গায়ে তাঁর কথায় দাগ রেখে গিয়েছে।

একখানাই ঘর বলতে গেলে। পাশের বারান্দা পার হয়ে অন্য ঘরখানা জুড়ে যে খাট তাতে শুয়ে এক রোগা ডিগ্ ডিগে টাকপড়া মাঝবয়সী ভদ্রলোক। তিনি সোনা-র বড়দা। উত্তর কলকাতার কোন ইস্কুলে মাষ্টারি করেন। সোনার সঙ্গে চেহারার কোন মিল নেই। পরে জানতে পারলাম তাঁর দ্বিতীয় ছেলে সোনার দাদামণি কয়েকবছর আগে হঠাৎ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে পাদরী হয়েছেন। সোনাদের ঘরখানায় দুপুরেও আলো জ্বেলে রাখতে হয়। একদিকে জানলা আছে তবে সে জানলার গা ঘেঁষেই ইঁটের পাঁচিল। বাইরে কটকটে রোদ্দুর থেকে এসে ঘরখানায় ঢুকে আমি প্রথমটা চোখে কম দেখি। সোনা-র মা-র দিকে চোখ পড়তে আরও অবাক হলাম— একেবারে মঙ্গোলীয় চোখ। পণ্ডিতরা বলতে পারেন ভটচায বামুনের ঘরে এই মঙ্গোল চোখ এল কেমন করে। সে চোখের



ভাষায় বিদ্রূপ না আনন্দ ছিল প্রথম সম্ভাষণে তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

সোনা আমায় বসিয়ে বাইরে গেল। মা আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সোনার অনেক বন্ধু, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কত বন্ধু নিয়ে আসে। আর আমায় সব সামলাতে হয়। এই যেমন পানু জুটেছে। একেবারে বদ্ধ পাগল। অবশ্য পাড়ার ছেলেরাই ওকে পাগল করল দাঙ্গার সময়। পানু সোনা সোনা করে রোজ আসবে আর আমায় তার আবদার সামলাতে হবে।"

আমি হেসে বললাম, "আমার মাথা কিন্তু খুব পরিষ্কার।"

"হ্যাঁ, তা তোমার চেহারা দেখেই বুঝেছি। একটু অতিপরিষ্কার বোধ হচ্ছে।"

সোনার মা এবার আমার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আমার কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে তো! তা আমি ঐ রকম ভাবেই বলি। সোনার এক বন্ধু—শুনলাম সে আবার কবি—ভারী মজা হয় তাকে নিয়ে। দরজার কাছে এসে মিনমিন করে ডাকে সে। আমি বেরিয়ে আসতেই তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।"

"কেন, আপনি ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করেন নাকি?"

সোনার মা এবার হেসে ফেলেন। বলেন, "না না, কি জানো, মিনমিন করা আমার দুচক্ষের বিষ। আমার মেয়েদের সঙ্গে মিল হয় না এ জন্যে। এই যেমন বেলা বলে একটা মেয়ে আসত সোনার কাছে। একদিন একটা কৌটো নিয়ে এসে চৌকির গোড়ায় রেখে বললে, সোনাকে এই গুঁড়ো দুধটা খাওয়াবেন মাসিমা। আমি বললাম, ওটা তোমার গালেই মেখো মা। মেয়েটা এমন ঘাবড়ে গেল যে আমার সামনে আসাই ছেড়ে দিল।"

আমি সজোরেই হেসে উঠেছিলাম গালে গুড়ো দুধ মাখবার সুপারিশে। সোনার মা গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, "আমি চাই না আমার ছেলেকে কেউ ঠকিয়ে যায়। সোনা সবতাতেই মেতে ওঠে। যারা তাকে নাচায় তারা কদিন যেতে না যেতেই সটকে পড়ে। তখন সোনা গুম্ হয়ে যায়। আমি তার কষ্ট বুঝতে পারি। আমাকেই সামলাতে হয় সব।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, "আর কি হয়েছে জানো, অসুখটা হবার পর থেকেই ও একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। চিরদিনই ওর মধ্যে একটা ক্ষ্যাপা ভাব আছে। আমার বড় ছেলে, দেখতেই পারছো, একেবারে অন্যরকম। একদম ছাপোষা। মেজ সীতেশ বেশ ছিল গান বাজনা নিয়ে, হঠাৎ কি হল, যীশু যীশু করে ক্ষেপে উঠল। এখন আবার পাদরী হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে এমন আজগুবি লাগে। তবে সীতেশের ক্ষ্যাপামির মধ্যেও একটা হিসেব আছে। বেশ গুছিয়ে নিয়েছে যাকে বলে। আমার ভয় সোনাকে নিয়ে। ও সত্যিই পাগল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার মেজ ছেলের কি আগে ধর্মে মতি ছিল?"

সোনার মা বললেন, "দূর! আমারই কি ছাই প্রথমে বিশ্বেস হয়েছিল। সীতেশ যখন এসে আমায় বললে, 'মা, আমি খৃষ্টান হয়েছি' তখন ভাবলাম বুঝি আমায় ঠাট্টা করছে।"

"তাহলে?"

"তা আমি কি করে বলব? চাকরি করত সাহেবদের এক অফিসে। সাতজন্মে কোন ধর্মের ভাব দেখি নি। তারপর কিছুদিন একেবারে উধাও। ফিরে যখন এল তখন এক অন্য সীতেশ। আমি

তাকে একদম চিনি না। বললে, 'মা, আমি যা পাপ করেছি তা শুনলে তোমরা সবাই আমার মুখে থুতু দেবে। যীশুর পবিত্র রক্ত আমায় ত্রাণ করবে। তোমাকেও মা...' আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বললাম, 'সীতু, তুই যীশু যীশু করলেও আমার ছেলেই থাকবি কিন্তু আমায় যীশু যীশু করতে বলিস নে'।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "পাপ মানে তো মেয়েমানুষদের সঙ্গে কোন ব্যাপার। তাতে আর কি হয়েছে? তার জন্যে যীশুর কাছে দৌড়বার কি দরকার পড়েছিল?"

"দাদামণি এখন কোথায়?"

"সে ভালই আছে। আমি ভয় পাই সোনার জন্যে। ওটা কোন হিসেবের ধার ধারে না। সীতেশ খুব ভাল বলতে কইতে পারে। সে একটা ট্রেণিং নিয়ে পাদরী হয়েছে, ভাল বিয়ে করেছে, প্রচার করার জন্যে গাড়ি পেয়েছে। আগে যে সাহেবদের ষ্টোরে কাজ করত এখন দেখি তার চেয়ে ভালই আছে। আমি ভয় পাই সোনার জন্যে।"

সোনার ছোট বোন মিনু এসে ঘরে ঢুকল। মিনুর বয়স কুড়ি একুশ হবে। একহারা ফর্সা চেহারা। চোখ দুটো ছোট। তবে ভুরু জোড়া সুন্দর। একটা চাপা হাসির ভাব আছে তার মুখে, তা প্রথম দৃষ্টিতেও চোখ এড়িয়ে যায় না। আমাকে দেখে একটু ইতস্তত করে মার দিকে ফিরে বললে, "দ্যাখ দেখি ছোড়দার কাণ্ড। আবার সেই ফুলওয়ালাটা এসেছে একটা গামছায় কি সব মিষ্টি ফিষ্টি নিয়ে। ও খেলে তো নির্ঘাত কলেরা হবে।"

মা বললেন, "ভেতরে রেখে দে, এখন না বললেই হবে।"

খুকু গামছায় মোড়া বস্তুটি আনতেই বললেন, "দেখি কি আছে।" দেখবার মত কিছুই না। খবরের কাগজের ওপর সিন্নী, কয়েকটা

কাটা ফলের টুকরো আর বাতাসা। গামছায় জড়ানো থাকার ফলে একাকার হয়ে গেছে।

আমিও বললাম, "কলেরার সিজন শুরু হচ্ছে। এখন আর দেবেন না ওকে ওসব খেতে।"

মা বললেন, "কে দিচ্ছে? এই এক হয়েছে নাছোড়বান্দা ফুলওয়ালা, কোথায় রাজাবাজার বস্তিতে থাকে। এই ফুলওয়ালা আর এক পানুদা। তারপর এক আর্টিস্ট আছে, সে খালপারে গিয়ে স্কেচ্ করবে আর সোনাকে না হলে তার চলবে না। এই করেই দেখছি ওর সারাটা জীবন কেটে যাবে।"

মিনু আমার দিকে পেছন ফিরে বললে, "আর মা, ছোড়দা কেন যে ওদের সঙ্গে মেশে বুঝি না। সেদিন দেখি ফুলওয়ালাটার সঙ্গে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ফুলওয়ালাটা আগে নাকি বড় রাজমিস্ত্রী ছিল। এ পাড়ায় অনেক বড় বড় বাড়ি তার হাতে তৈরি। ফুলওয়ালাটা কি স্বপ্নে দেখেছে যে তার তৈরি করা বাড়িগুলোয় বাস করছে আর প্রত্যেকটা বাড়িতে তার এক একটা বিবি। আমি জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ছোড়দা লোকটার কথায় একেবারে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। ওর সব উল্টোপাল্টা ভাল লাগে। রমেনদা-ও তাই বলে। ওটা নাকি একটা স্টাইল। সবাই যা করে ছোড়দা তা করবে না।"

আমি বললাম, "রমেনদা কে?"

সোনার মা বললেন, "রমেন আমার এক জ্যাঠার ছেলে। আপন জ্যাঠা নয় অবশ্য। রমেন তো রোজই আসে। এই এখনই হয়তো এসে পড়বে। মিনুর সঙ্গে ওর বনে খুব। আর সোনার সঙ্গে একেবারে না। প্রায় কথা বন্ধ।"

"রমেনদা……ফার্মে কাজ করে," মিনু বললে। লক্ষ্য করলাম বিলিতি ফার্মটার নাম করবার সময় এক চাপা আনন্দ তার কথার মাঝখানে ঝিলিক মেরে যায়।

বিকেল হয়ে আসছে সেটা একটা পুরনো টাইমপিসে মালুম হচ্ছিল আর মালুম হচ্ছিল ধোঁয়া দেখে। ধোঁয়া কোনদিক দিয়ে আসছিল প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপর দেখলাম বন্ধ দরজার কার্নিশের ফাটা দিয়ে, দেয়ালের ফোকর দিয়ে গোল গোল হয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরে ঢুকছে। ছেলেবেলায় বাইরে মানুষ হয়েছি, আর আমাদের পাড়ার দিকটায় এখনও ধোঁয়ার অত্যাচার খুব বেড়ে না যাওয়ায় বোধহয় ওরকম ধোঁয়ায় বেড়ে ধরার কায়দার দিকে তাকিয়ে আমায় কিছুটা আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল।

মিনু হঠাৎ বললে, "আমাদের বাড়ি এলে ধোঁয়া খেতেই হবে। আমাদের তো আর বসবার ঘর, খাবার ঘর, কাপড় ছাড়ার ঘর বলে আলাদা কিছু নেই, সব এই এক ঘরে।"

মনে মনে একটু চটে যাই। মেয়েটা ঘরে ঢুকে আমায় দেখে প্রথমে ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা নিচু করেছিল। তার হঠাৎ এরকম রণমূর্তি আমায় একটু বিচলিত করে। বললাম, "তুমি অনেকটা ঠিক বলেছো, তবে আমাদের কাপড় ছাড়ার ঘর নেই, বসবার ঘর, আর শোবার ঘর আছে।

মা বললেন, "তুমি এখনই চান করে নাও মিনু, পরে আমরা জল পাবো না।" উঠে দাঁড়িয়ে তিনি একটা হাত পাখা দিয়ে ধোঁয়া তাড়াতে লাগলেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো এখন আমাদের নাক মুখের সামনে থেকে সরে ঘরের ছাদে জমাট বেঁধে রয়েছে। দেয়ালে টাঙানো ব্র্যাকেট থেকে মিনু তার জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ

তক্তাপোষের কোণটার দিকে তাকিয়ে তার ভারী লজ্জা হল। তক্তাপোষের কোণে বেরিয়ে আছে সোনার মাথার তেলচিটে বালিশ। মিনু চাদর দিয়ে তা ঢাকতে ঢাকতে বললে, "তিনদিন থেকে তোমায় বলছি মা বালিশের ওয়াড়গুলো ফেলে দিতে, আমি কেচে দেব। তুমিও ঠিক তোমার ছেলের মতো হয়েছ।"

মিনু বেরিয়ে যাবার পর মা বললেন, "এবার আই, এ, পাশ করতে পারল না। তারপর থেকেই কেমন হয়ে গেছে। যাকে দেখছে তাকেই বলছে চাকরি দাও। আমি পই পই করে বারণ করেছি, কিছুতেই শোনে না। খালি বলে, 'আমায় একটা চাকরি দাও নইলে বিয়ে দাও। এমনি বসে বসে বুড়ো হয়ে যেতে পারব না।' সেদিন কোন একটা বিশ্রী জায়গায় গিয়েছিল একলা একলা। বড়বাজার না কোথায়। সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচে। এখন যেই রমেন বলেছে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবে অমনি তার পেছনে ঘোরাঘুরি করছে।"

এমন সময় দরজার গোড়ায় একটা গাড়ি থামবার আওয়াজ এল। মা বললেন, "ঐ যে, বোধহয় রমেনই এল।"

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি ঘরে ঢুকল।

বছর বত্রিশেক বয়স হবে লোকটির। ফর্সা আঁটসাট গড়ন, পেণ্টুলুনের ওপর হাফ শার্ট। রমেন আসতেই সোনার মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা শুনলাম অসুস্থ হয়েছিলেন, কেমন আছেন এখন ?

রমেন হেসে উঠল। আর আমি চমকে উঠলাম সে হাসি শুনে। এরকম হাসি আগে কখনও শুনি নি। লেজে বাড়ি খাওয়া কুকুর যেমন কুঁই কুঁই করতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে তেমনি রমেন কথা বলার

সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে একরকম আওয়াজ বার করতে থাকে, "কি যে বলেন আপনি, কি যে বলেন! মা-র আবার কোন ব্যামো হয়। বছরে বছরে ছেলে হবার ব্যামো। সেই সামলাতে সামলাতেই সারা জীবন গেল।"

সোনার মা বললেন, "তোর মুখটা যে একেবারে নর্দমা তা সবাই জানে। তবে ঘরে একটা নতুন লোক আছে। সেদিকে তো খেয়াল রাখবি।"

রমেন আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য বিচলিত না হয়ে আমাকেই সম্বোধন করে বললে, "তা দেখুন আমি কি খারাপ বলেছি। আমরা হলাম চোদ্দটা ভাইবোন, সামনের বছরে পনেরো হব। এর ওপর মা বলেছে বিয়ে করতে। আমি মা-কে বলেছি, তোমার ছেলে আর আমার ছেলে এক সঙ্গে হবে এটা কি ঠিক হবে মা? মা তবু ছাড়বেন না।"

এই এতক্ষণ কথা বলার সময় রমেন ক্রমাগত কুঁই কুঁই আওয়াজ করেছে আর সারাক্ষণ আমার অসোয়াস্তি হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে লোকটি সুপুরুষ। নাক টানা, চুলের কমতি নেই, চোখ দুটো বড়ই। তবে তার মুখের হাঁ-টা বোধহয় বেমানান বড় আর তার সঙ্গে সেই হাসির আওয়াজ—লোকটাকে অভদ্র বললে কিছুই বলা হয় না।

হঠাৎ চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রমেন বললে, "সোনা আপনাকে জুটিয়েছে মনে হচ্ছে।"

"জোটাবে কেন, আমি নিজেই এসেছি।"

"ও, তা আপনাকে কোন পাব্লিসিটি অফিসে যেন..... "

"না না, আমি একটা ওষুধের ফার্মে কাজ করি।"

রমেন আবার তার কুঁই কুঁই আওয়াজ শুরু করল। আমার দিকে এক রকম রহস্যময়ভাবে তাকিয়ে সামান্য নিচু গলায় বললে, "কমিশনে কাজ করা হয় নিশ্চয়।"

আমি আবার চমকে যাই। লোকটাকে মনে মনে তারিফও করি। খালি মনে হতে থাকে রমেন সকলেরই দুর্বল স্থানটা খোঁজবার চেষ্টা করছে আর ঠিক সে জায়গায় অন্তরঙ্গ হয়ে সবাইকে হাত করে নিচ্ছে। যেমনভাবে সে মিনুকে চাকরি জোগাড় করে দেবে তেমনি আমায় কমিশন দেবার ব্যবস্থা করবে। সোনাকে বোধহয় বাগাতে পারে নি। সে নিশ্চয় তার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার মনে পড়ল আমার অফিসের শ্যামবাবুর কথা। লোকটা এই 'কমিশনের' ভিত্তিতে বিজনেস পার্টির সঙ্গে আলাদাভাবে কন্ট্র্যাক্ট করায় একবার প্রায় চাকরি গিয়েছিল, অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। আমাদের লাইনে কোম্পানিকে না জানিয়ে এরকম ব্যক্তিগত বাণিজ্য কেউ কেউ করে।

একটু দৃঢ়ভাবেই বললাম, "না রমেনবাবু, আমি ওরকম বাণিজ্য করি না।"

রমেন কিছুমাত্র লজ্জিত হল না। বললে, "বলেন তো আমার অনেক পার্টি জানা আছে।"

মিনু স্নান শেষ করে শাড়ী পাল্টিয়ে ঘরে ঢুকল। একটা নীল শাড়ী আর সাদা সিল্কের ব্লাউসে তার হাল্কা শরীরখানা ভালই দেখাচ্ছিল। আমার মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে বললে, "আপনি রমেনদার কথা ধরবেন না। রমেনদা ওরকমই বলে।"

রমেন আমাকে লক্ষ্য করেই বলে, "আরে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন। সব তো পেটকা-ওয়াস্তে। সোনাকে আমি বলি, তোর ঐ

সব কলা শিল্প আর্ট মার্ট সব পেটকা-ওয়াস্তে। এই তো এক বিখ্যাত কথাশিল্পী, তাকে বলেছি সিনেমার লাইনে ঢুকিয়ে দেব। আমার বাড়িতে রোজ সকালে এসে চটির শুকতলা ছিঁড়ছে। টাকার কথা শুনলে লোকটার জিভ দিয়ে জল গড়ায়। ওসব কলা শিল্প 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে'—সব স্যার পেটকা-ওয়াস্তে।"

রমেন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। সোনার মা এবার উঠলেন। পাশের ঘরে তাঁর ছোট নাতি ঘুম থেকে উঠে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। বললেন, "তুমি বস, আমি একটু থামিয়ে আসি।"

রমেন এবার আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, "আর যে কটা শালা এই কলা আর শিল্প করে বেড়ায় জানবেন সব কটার মা-বাপের ঠিক নেই। আমরা বুঝলেন না 'লোয়ার ডেপথের' মানুষ। আমাদের কোন মেয়েমানুষকে ভালো লাগল, অমনি সোজাসুজি গিয়ে বললাম। তার ভাল না লাগে হল না। আর এই কলা-রা বলবে, চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, হৃদয়ের দুয়ার আজ খুলে গিয়েছে। এইভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একেবারে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসে তারপর বলবে—"

মিনু চেঁচিয়ে উঠল, "রমেনদা কি হচ্ছে ?"

সোনার মা এসে বললেন, "কই রমেন, তোমরা না কোথায় যাবে বলেছিলে আজ।"

রমেন তাড়াতাড়ি বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এখান থেকে একবার সেজ জেঠীমায় বাড়ি যাব। বেলুড় নিয়ে যেতে হবে। জেঠী সাধছে একমাস ধরে। তার মেয়েগুলোও ছাড়বে না, তারাও যাবে।"

যাবার আগে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রমেন বললে, "আপনি কলাটলার মধ্যে নেই তো, দেখবেন।"

আমার মুখচোখ নিশ্চয় খুব প্রসন্ন ছিল না। মা আমার মুখের

দিকে তাকিয়ে বললেন, "একেবারে বকা ছেলে রমেনটা। একপাল ভাইবোনের দাদা। বাইরে সব জায়গায় এমনি হ্যা হ্যা করে বেড়ায়। তবে ওর একটা অন্য দিকও আছে। ওরই ওপরে সমস্ত সংসারটা। ও না দেখলে এতদিন ভাইবোনগুলো কোথায় ভেসে যেত।"

আমি বললাম, "সোনার দাদামণির কথা শুনে খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"আজ রোববার না, আজকেই তো আসবার কথা সীতেশের। তুমি আর একটুখানি বস। সোনাটা কি অদ্ভুত। বন্ধুকে ফেলে রেখে নিশ্চয় পড়াতে গিয়েছে। এখনি ফিরবে নিশ্চয়। মিনু, সোনা এখন ফিরবে না?"

মিনু পাশেই রান্নাঘরে রুটি সেঁকছিল। বললে, "ছোড়দার কোন খবর রাখি না বাবা। কেউ কখনও যায় এভাবে বন্ধুকে বসিয়ে রেখে। ওর সবতাতেই বাড়াবাড়ি।"

আর একবার গাড়ির আওয়াজ পেলাম। মিনু চেঁচিয়ে উঠল, "দাদামণি এসেছে নিশ্চয়।"

দাদামণি এসেই জানালেন যে তাঁদের পাদ্রীদের কনফারেন্স হচ্ছে। সেই উপলক্ষ্যে ভয়ানক ব্যস্ত তাঁরা। কিছুদিন হয়ত আসতে পারবেন না ইত্যাদি। দাদামণি সত্যিই সুপুরুষ। সোনার মতোই লম্বা চেহারা তবে হাল্কা গড়ন। মুখখানাতেও একটা শ্রী আছে তারপর গলার আওয়াজে এমন এক আকর্ষণ আছে যে যতক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন আমি ভাবছিলাম যীশু সম্বন্ধে খুব উৎসুক না হলেও দাদামণির গলায় ধর্মোপদেশ শুনতে মন্দ লাগবে না আমার। দাদামণি এসে সবাইয়ের সঙ্গে আলাপ করলেন। তাঁর বড় ভাইপো বাঘা এসে যখন তাঁর চুল টানতে শুরু করল তখন তাঁকে দেখে ধারণা হচ্ছিল না যে তিনি ধর্মপ্রচারক।

আমার সঙ্গে আলাপ জমে গেল সহজেই। কোথায় চাকরি করি, কোথায় থাকি ইত্যাদি প্রশ্নের পর তিনি ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় ঘুরেছেন, হাজারিবাগের কাছে ওঁরাওদের মধ্যে প্রচার করতে গিয়ে দিনে কমাইল সাইকেল করেছেন এমনি অনেক কথার মধ্য দিয়ে আলাপ অগ্রসর হচ্ছিল। দাদামণিকে আমার ভাল লাগতে শুরু করেছিল। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করলেন "তুমি নিশ্চয় ভগবান মানো না?"

প্রশ্নটা করলেন এমনভাবে যেন তিনি আমার সামনে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। মা বললেন, "সীতু, তুই তোর যীশু বাদ দিয়েও তো অন্য আলাপ করতে পারিস। ওরা এখনকার ছেলে..."

"সেই জন্যেই তো বলছি, তুমি ভগবান মানো?" খুব তীক্ষ্ণ কঠিন-ভাবে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম, "ভগবান মানি না বললেও কিছু বলা হয় না আবার মানি বললেও কিছু বলা হয় না।"

দাদামণি রেগে উঠে বললেন, "হ্যাখো তোমায় একটা সোজা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। কই রাস্তায় যখন আমি প্রচার করি তখন তো সেখানকার লোকজনকে ডেকে প্রশ্ন করি না। তুমি সোনার বন্ধু তাই তোমায় জিজ্ঞেস করছি।"

আমি চুপ করে থাকি। কতগুলো ব্যাপারে ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার বিশ্বাস জাগে কিন্তু সে ব্যাপারগুলো ধর্মপ্রচারকদের আওতার বাইরে। যেমন মৃত্যু আমার কাছে খুব রহস্যময়, প্রায় ভগবানের মতো। এই স্টেপটোমাইসিন ক্লরোমাইসিটিনের যুগেও আমি কারও মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালে ভগবানের কথা ভাবি। মৃত্যুকে

যেমন ব্যাখ্যা করতে পারি না ভগবানকেও তেমনি ব্যাখ্যা করতে পারি না। কিন্তু দাদামণিকে কি উত্তর দেব? তাঁর এই রূঢ় প্রশ্নের এক রূঢ় জবাবই দেওয়া যায়। কিন্তু তা দিয়ে লাভ কি?

বললাম, "হ্যাঁ কি না যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলব, না। কিন্তু এ বলার পরও আমার কথা ফুরিয়ে যায় না।"

আমার কথা শুনে দাদামণির মধ্যে হঠাৎ এক পরিবর্তন এল। তাঁর মুখচোখ আনন্দে নেচে উঠল। বললেন, "দেখলে মা, দেখলে, আমি ঠিক দেখেই বলেছিলাম—যীশুর কি কৃপা!" তারপর তাঁর থলি থেকে কয়েকখানা চটি বই বার করে বললেন, "তুমি আমাদের চার্চে সামনের রোববার সকালে যাবে কেমন? আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। আর এই বইগুলো····"

ভয়ানক বিরক্ত হলাম। ভগবানের দালালদের আমি চিরদিন এড়িয়ে চলি। বললাম, "দেখুন, আপনাদের অনেক মতের সঙ্গে আমার কোন মিল নেই।"

"মিল আজকে না হোক কালকে হবে।"

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "কোনদিনই হবে না। আপনারা তো এই ইহলোকটাকে একেবারে পাত্তাই দেন না। আর আপনারা কেন, হিন্দু মিশনের যত সন্ন্যাসী, সকলেরই এক ব্যাপার। শুনি সন্ন্যাসী হতে গেলে নিজের পিণ্ড নিজে খেতে হয়। এরকম আচার আপনাদেরও আছে হয়ত। আপনারা সব মরে বেঁচে থাকতে চান। আপনাদের সঙ্গে আমার কোন কালে মিল হবে না।

দাদামণিও উত্তেজিত হয়ে বললেন, "অনন্ত নরক আছে তোমার, অনন্ত নরক। তোমার, সোনার, মা-র, সকলের। তোমরা এখন বুঝতে পারছো না, কিন্তু দেখো, একদিন আসবে।"

আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম, "দেখুন শাপ দিয়ে কিংবা নরকের ভয় দেখিয়ে শায়েস্তা হবে না মানুষ।"

মা শান্তভাবে বললেন, "সীতু, তোরা দেখছি সব এক। পাপ করেছি এ ভয়টা একবার যদি ঢুকিয়ে দিতে পারিস তাহলেই চালকলা সিকি আধুলিটা পাবি। এখানে যীশুও যা কেষ্ট ঠাকুরও তাই। মিনুটা রোজ ঠাকুরের ফটোয় ফুল বেলপাতা দেয়। কিন্তু আমার আর ঠাকুরসেবায় ইচ্ছে নেই। আচ্ছা মনে কর সীতু, বিদ্যেসাগরের মতো কোন বড়লোক, ভাল লোক, যিনি পাপ করেন নি অথচ ভগবান মানেন না, তাঁকে নিয়ে তোরা কি করবি?"

"বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন।"

"ধর, মানতেন না।"

"প্রত্যেক সৎলোকই মা ভগবান মানেন।"

"তুই তাহলে আমার মতোই পণ্ডিত সীতু," মা ধীরভাবে বলেন।

দাদামণি চলে যাবার পর আমি একবার অবাক হয়ে মা-র দিকে তাকালাম। দাদামণির সঙ্গে, মিনুর সঙ্গে তাঁর মেজাজের বৈপরীত্য অতি স্পষ্ট। মিনুর মতো একটা কচি মেয়ের বুড়ির মতো মেজাজ, সবাইকে সে যেন সন্দেহের চোখে দেখে। কোন ব্যাপারেই উৎসাহ উদ্দীপনাকে সে ঠাট্টা করে। আর এই খয়া শুকনো খ্যাংরা কাঠির মতো শরীর, সোনার এই মায়ের প্রাণ এমন সজীব থাকে কি করে? এখানেই একটা ভগবানের কথা মনে আসে না? তিনি যদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করেও অন্তত একটা কথার কথা হিসেবে ছেলের ধর্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন তাহলে হয়ত সামনের অকেজো বেতের চেয়ারখানা ছাওয়া যেত, হ্যাণ্ডেল-ভাঙা কাপগুলো বদলানো হত। এই পিতপিতে বাল্বের চেয়ে আরও চড়া পাওয়ারের আলো রাখবার

সঙ্গতি থাকত। সোনার সঙ্গে আলাপ করে আমার যে একটু চমক লেগেছে সে চমকের কিছুটার জন্যে কি তার মা দায়ী ?

সে রাত্তিরে সোনা ফিরল বেশ দেরি করে। ছেলে পড়িয়ে সে সচরাচর রাত সাড়ে আটটার মধ্যেই ফেরে। আজ প্রায় একঘণ্টা দেরি। চেহারাটা একটু অন্যরকম লাগল। মুখখানা থমথমে ভারী। চোখের পাতা ফোলা। আলোর দিকে মুখ তুললে দেখলাম গাল দুটোয় কালচে লাল ছোপ লেগেছে। আমাকে দেখেই তার চোখ আনন্দে জ্বলে উঠল। বললে, "আপনি এখনও আছেন। আমি বড্ড আটকে গেছিলাম।"

সোনার খাওয়া দাওয়া কয়েক মিনিটের ব্যাপার। উবু হয়ে বসে একটার পর একটা রুটি স্রেফ গুড় দিয়েই মেরে দিল। মা বললেন, "আস্তে খা, ডাল নিয়ে আসছি।" ডাল আসবার আগেই সোনার খাওয়া শেষ। ডালের বাটিটা এক চুমুকে শেষ করে সোনা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনি সামনের পার্কে গিয়ে একটু বসুন, আমি আসছি।"

কবারই বা এসেছি সোনাদের পাড়ায়, কিন্তু এ পাড়াটা আমার ইতিমধ্যেই ভাল লাগতে শুরু করেছে। এই এক টুকরো পার্কে ঢুকে আমি অনুভব করলাম সহরে বসন্ত আসছে। আর সে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। আমরা যখন আসামে ছিলাম তখন ঋতুর আসা যাওয়াটা লক্ষ্য করা আমাদের ভাইবোনদের এক প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু সেখানে পাহাড়ে, খোলা মাঠে, ধপধপে চাঁদিনীতে, দক্ষিণের বাতাসে, পায়ে হাঁটা পথে, আমের মুকুলের ভারী গন্ধে, রকমারি ফুলের বাহারে সে এক অন্য বসন্ত। আর সোনাদের পাড়ার চারধারে এই

রকওয়ালা পুরনো বাড়িগুলোর ফাঁকে গ্যাসের আলোর নিচে এই এক টুকরো জমিখানার ওপর দিয়ে যখন বসন্তের হাওয়া এসে গায়ে লাগল তখন আমার হিসেবী মনও একটু নাড়া খেল। চেয়ে দেখলাম পার্কের যে দুটো গাছ ফুটবল খেলার আক্রমণ থেকে নিজেদের তিলে তিলে বাঁচিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তারা দোল খাচ্ছে হাওয়ায়। যেটা সবচেয়ে পুরনো বাড়ি তার মাথার ঠিক ওপরে একটা তারা খুব জোরদার ভাবে জ্বলছে। আমি পার্কের বেঞ্চিতে এক অস্পষ্ট ম্লান চাঁদিনীতে সোনার অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকি।

সোনা পার্কে ঢুকতে ঢুকতেই বললে, "এই তিন বছর ধরে চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে মনে হয় আর পারব না এবার, গা এলিয়ে দি। মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হয় করার কিছু নেই।"

আমি তার কথাটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না। মনে হল আগের দিন যে প্রসঙ্গ উঠেছিল অর্থাৎ চারপাশের রুদ্ধ পরিবেশ, সেই সম্পর্কেই সে কথা তুলতে চায়। বললাল, "এটা তো আপনার একার সমস্যা না, আমাদের সকলেরই সমস্যা।"

সোনা অস্থির হয়ে বললে, "মোটেই সকলের না, মোটেই সকলের না। একেবারে আমার নিজস্ব। এই সোনা বলে যে জীবটি কবিতা পড়তে ভালবাসে, গান শুনতে ভালবাসে, থিয়েটার করতে ভালবাসে একেবারে এই লোকটির সমস্যা। আর কারুর যদি হয়েও থাকে তাতেই বা কি এসে যায়।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কাল রাত্তিরটার কথা ভাবছি। উঃ, আবার যদি সে রকম রাত আসে তাহলে হয়তো আমি পাগল হয়ে যাব। আমাদের ঐটুকু ঘর, দেখেছেন তো। তিনজনে শুয়ে আছি। আমি চৌকিটায়। কয়েকদিন থেকেই রাত্তিরে ঘুম আসছে না।

আবার যেন সমস্ত লক্ষণগুলো ফিরে আসছে শরীরের মধ্যে। হঠাৎ কি হল মা উঠে পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কিছুই না, একটা আরশোলা গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। তা ওগুলো আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। একে পুরনো বাড়ি। ফাটাফুটো সারানো হয় না কোন দিন। আরশোলা নিয়ে ভাবলে থাকব কি করে? বরং আমি আর মিনুই এক একদিন বিরক্ত হয়েছি, মুখে নাকে আরশোলা উঠলে চেঁচামেচি করেছি। মা কিন্তু কোনদিন করেন নি। কাল রাত্তিরে মা উঠে কাঁদতে লাগলেন। আমি আরশোলা তাড়াবার জন্যে আলো জ্বালতেই মার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মা আমাকে দেখেই "ওরে বাবারে ওরে বাবারে আমার কি হল!" বলে মাথা চাপড়াতে লাগলেন, হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, আর আমায় গাল পাড়তে শুরু করলেন। আপনি মার সে মূর্তি কল্পনাও করতে পারবেন না। আমায় বললেন, "বুড়ো দামড়া, বসে বসে খাচ্ছিস, লজ্জা করে না।" আর বারবার করে আমার মৃত্যুর জন্যে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। মিনু কয়েকবার চেষ্টা করেছিল থামাতে তারপর মার সেই হিংস্র মেজাজ দেখে চুপ মেরে গেল। আমি ঠোঁট কামড়ে চৌকিতে উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। শেষে আর থাকতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "আর যদি একটা কথাও বল মা আমি এক্ষুনি এই মাঝরাত্তিরে বেরিয়ে যাব।" মা তারপর শুয়ে শুয়ে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন। উঃ সে কি রাত।"

আবার দক্ষিণের হাওয়া উঠল। পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিষ্পত্র দাঁড়াগুলো দোল খেয়ে গেল, আর একটা যে পামগাছ দাঁড়িয়ে আছে তার পাতাগুলোর মধ্যে শব্দ উঠেই চুপ করে গেল চারদিক।

সামনের পুরনো বাড়িটার আলো নেভানো ছিল। ;দোতলার ঘরখানায় কয়েকমুহূর্তের জন্যে আলো জ্বলে উঠল। আমি সেদিকে তাকাতেই সোনা বললে, "ও বাড়িটায় কাল একজন মারা গিয়েছে, আমারই বন্ধু।"

"কি হয়েছিল?"

"কিছু হয় নি। কাল খুব সকালে এসেছিল আমাদের বাড়ি। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। দেখি একটা হাতির দাঁতের খুব দামী ক্ষুর নিয়ে এসেছে। বললে, একজোড়া তাকে কে উপহার দিয়েছে। আমাকে একটা তাই দিয়ে গেল।"

"তারপর?"

"তারপর আর একটা ক্ষুর নিজের গলায় দিয়েছে কাল রাত্তিরে।" আমি চমকে উঠে বললাম, "আপনাকে আর কিছু বলে নি, খালি ক্ষুরটা দিয়ে চলে গেল?"

"ব্যস, কোন কথা নেই। তার ব্যবহারে কোনরকম আলাদা কিছু দেখলাম না। আমি কেন, কেউই দেখে নি। ঠিক যেমনটি খায় তেমনটি খেয়েছে, বিকেলে রকে বসে যেমন আড্ডাটি মারে তেমনি আড্ডা মেরেছে। এমন কি কেন মরল কেউ তা ঠিক বুঝতে পারল না।"

"প্রেম ট্রেম কিছু · "

সোনা চেঁচিয়ে বললে, "না না, আর তা থাকলেও বা কি হয়েছে। তার বয়সও হয়েছে। খুব একটা ভাবপ্রবণ ছেলে ছিল না। এখন অবশ্য অনেক কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আমার সাংঘাতিক লেগেছে ব্যাপারটা। আজ সকালে উঠেই ক্ষুরখানা দেখলাম। বেশ দাম হবে। বাঁটের ওপর চমৎকার কারুকার্য। ভয়ানক ধার কিন্তু দেখতে এমন নিরীহ। আমার কেমন মনে হচ্ছিল, যদি একটা বড় ঝকঝকে

ছুরি সে নিজের গলায় দিত তাহলে এতখানি দুর্বোধ্য মনে হত না ব্যাপারটা।"

সোনার কথা আমি ঠিক ধরতে পারি না। মৃত্যু মানেই তো মৃত্যু। তার আবার রকম কি থাকতে পারে?

সোনা আমার মনেব কথাটা যেন বুঝতে পারে। বলে, "না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মৃত্যু ঠিক এক রকম না। এক রকম হয় না। তার রূপগুলো আচমকা, তাই আমায় ভয় করে। আমাকে যদি একটা ধারাল ছুরি দিয়ে যেত আমার অতো খারাপ লাগত না। কিন্তু ঐ ক্ষুরটা আমি সহ্য করতে পারলাম না। ঐ রকম একটা নিষ্প্রভ নিরীহ চেহারা এমন এক সাংঘাতিক ভবিষ্যত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভেবে আমি আর রাখতে পারলাম না ক্ষুরটা নিজের কাছে। মা বলেছিলেন কাউকে দিয়ে দিতে। কিন্তু আমি ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছি।"

সোনা সামনের বাড়িটা থেকে চোখ নামিয়ে বললে, "আর ঠিক এই ব্যাপারটার মতো আর একটা ব্যাপার এমন বিশ্রী লেগেছে। এগুলো দেখলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আমার বুদ্ধি চিন্তা সব অসাড় হয়ে যায়। ঠিক এমনি অসহায় লেগেছিল আমাদের কালুটা মারা যাবার সময়।"

আমার মনে হল সোনা বোধ হয় তার দাদার ছোট ছেলেমেয়ের কথা বলছে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সে বললে, "কালু আমাদের বেড়ালটা। কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছে।"

আমার মুখে হাসির রেখা একটু ফুটে উঠতেই সোনা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, "আপনি ঠিক বুঝবেন না, ঠিক বোঝাতে পারব না। আপনি তো কখনও দাঁড়ান নি মৃত্যুর সামনে। আর আমি এ কবছরই দাঁড়িয়ে আছি। তার নিঃশ্বাস আমার মুখে এসে লাগছে।"

আমি চুপ করে থাকি। সোনা বলে, "সে কি কষ্ট, কাউকে বোঝাতে পারা যাবে না। মনে হল কালুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও মরছি। তার চমৎকার শরীরের রোঁয়া ধীরে ধীরে পড়ে যেতে লাগল। আর তার সেই ফুলো ফুলো আদুরে শরীর একেবারে তুবড়ে একটা কঙ্কাল আর চামড়ায় এসে দাঁড়াল। শেষের দিকে সে খেতে পারত না। মা আর মিনু দুধের বাটি সামনে রেখে তাকে আদর করে ডাকত। আর কালুটা তাকিয়ে থাকত। সে চোখ আমি ভুলব না। তার সমস্ত গায়ে মৃত্যুর ছায়া নেমেছে। আর সে যেন তা বুঝতে পেরেছে। একেবারে নিনিমেষ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। মারা গেলে আমাদের বড়দা, যে লোকটার কোন ব্যাপারেই কোন হুঁস নেই সে লোকটাও বললে কালুকে ডাষ্টবিনে না ফেলে দিয়ে খালপারে গিয়ে মাটি চাপা দিতে। যখন ফিরে এলাম মনে হচ্ছিল আমার অনেকখানি মাটি চাপা দিয়ে এলাম।

আমি ধীরে ধীরে বললাম, "আপনার অবশ্য একটাই সমস্যা, অর্থাৎ বাঁচা। কিন্তু যারা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে সুস্থ শরীরে, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে, অফিসে কাজ করে, সিনেমা দেখে, বৌ-কে ভাল-বেসে, বৌএর সঙ্গে ঝগড়া করে—তারা কি ঠিক বেঁচে আছে? যাকে সত্যিই বাঁচা বলে সেই অস্তিত্ববোধ কি আমাদের বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে আছে? আপনার সুস্থ শরীর হলে আপনার বাঁচার সমস্যাটা অন্যরকম হত। যেমন মনে করুন আমাদের অফিসের শ্যামবাবু যে ভাউচার লিখছে আর মোটা হচ্ছে। কিন্তু..."

সোনা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললে, "আমি তা জানি না, শুধু জানি আজকে আমার বাঁচাটা এত দরকারি, এত ভয়ানক দরকারি। না, আমি বোঝাতে পারব না আপনাকে।"

"আমি বুঝতে পারছি আপনার বাঁচার আগ্রহটা কিন্তু আরও যে কথা থাকে।"

সোনা চেঁচিয়ে উঠল, "না, আপনি বুঝতে পারছেন না, বুঝতে পারছেন না। নেহাত একটা বিচক্ষণ মানুষের মতো, উকিলের মতো কথা বলছেন। আমি তো মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে বেঁচে উঠেছি। আমার সামনে সমস্ত বাঁচার চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আমার কৌতূহল হয়। বলি, "কি রকম?"

"আজ আমার মা হাজারবার মর মর করে অভিশাপ দিলেও আমার মরবার ইচ্ছে হয় না। আগে তো কলেজে আমায় আপনি দেখেছেন। বড় বড় কথার জাহাজ ছিলাম। কিন্তু ভেতরে ছিলাম একেবারে এতটুকু। কিংবা হয়ত কিছুই ছিলাম না, কিচ্ছু না।"

এমন দৃঢ় সিদ্ধান্তের মত কথাটা সে বললে যে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। বললাম, "কিচ্ছু না কেন বলছেন?"

"হ্যাঁ কিচ্ছু না, একেবারে কিছুই ছিলাম না। যেদিন প্রথম চৌকিতে শুয়ে শুয়ে নিঃশ্বাসের কষ্ট হল ঠিক সেদিনই বুঝলাম বাঁচার কত দাম, কি একটা দামী জিনিষ আমরা কাদায় ঠেলে ফেলে দিচ্ছি, প্রতিমুহূর্তে আমাদের কাজে চিন্তায় যেমন তেমন ভাবে ব্যবহার করছি। তখনই মনে হল যদি আর একবার বাঁচার সুযোগ পেতাম তাহলে আমার আর কোন সমস্যাই থাকত না। তখন থেকেই আমি যতবার নিঃশ্বাস নিই ততবার মনে করি মরে যাবার মতো সমস্যা মানুষের আর নেই। আর সব সমস্যাই গৌণ।"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কিছু বলার আগেই সে বললে, "তখন আমি কি ছাই জানতাম, কি অদ্ভুতভাবে আমি

আমার চারপাশের লোকজনকে অপমান করছি আমার ঔদাসিন্য দিয়ে, আমার স্বার্থপরতা দিয়ে। দাদামণিকে বাঁচিয়ে দিল তার যীশু। আর আমায় বাঁচিয়ে দিল সেই নিঃশ্বাসের কষ্ট, সেই প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা গা ভারী হওয়া, সেই অসোয়াস্তি, সেই মৃত্যু।" একটু চুপ করে থেকে বললে, "তখন কয়েকটা মেয়েকে কি নিদারুণ অপমানই না করেছি। তখন কিচ্ছু বুঝতাম না। মনে হত এটাই স্বাভাবিক। আমার অস্তিত্বটাই তৈরি হয়েছিল অন্যকে অসম্মান করার ভিত্তিতে।"

মেয়েদের ব্যাপারে সোনার আত্মগ্লানি আমার কাছে খুব স্পষ্ট হল না। এ ধরণের ভাব শুধু সোনার একারই নয়, অনেকেরই হয়ে থাকতে পারে। একটু তাকে টেনেই বললাম, "ওসব হৃদয়ের ব্যাপারে মানঅপমান আখছার হচ্ছে, ওতে আর অপমান কি?"

সোনা ম্লান হেসে বললে, "না ওরা হৃদয়-টিদয়ের ব্যাপারে একদম নেই। স্রেফ যাকে বলে বাজারের মেয়ে।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "আপনি তাহলে···"

"হ্যাঁ, ওটা আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হত না। অনেকটা প্রাতঃকৃত্যের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে যে একটা মন বলে পদার্থ থাকতে পারে যা নানা আলোয় নিজেকে খেলায়, সে মনের কোন হদিসই ছিল না আমার কাছে। আমরা পাড়ার রকে আড্ডা মারতাম, দল বেঁধে ওসব জায়গায় যেতাম। এখন সবাই ভদ্র শান্ত সামাজিক হয়ে গেছে। তাদের ছোটভাইরা এখন তাদের স্থান নিয়েছে। আমি ঠিক তাদের মধ্যেই থেকে যেতাম। কখনও নিজেকে চিনতে পারতাম না। কিন্তু চিনতে বড্ড দাম দিতে হল।"

খানিকক্ষণ মাথাটা পার্কের বেঞ্চিতে রেখে সোনা আস্তে আস্তে বললে, "আপনি আজ যান। রাত হল। বড্ড হাঁপ ধরছে কথা বলতে।"

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, "আপনি কেন বলেন নি এতক্ষণ?"

"না, সেরকম কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে", সোনা একটু হেসে বললে।

তিন

সোনার কথাগুলো সে রাত্তিরে অনেকক্ষণ মনে মনে নাড়াচাড়া করলাম। তার কথা মানতে গেলে আমার নিজেকে অস্বীকার করতে হয়, আমি যে ভাবে ভাল মন্দ বিচার করি সেই বিচারের কোন দাম থাকে না। সোনা কেন পানুদা হতে যাবে? ঐরকম একটা বিকৃত উলঙ্গ বদ্ধ পাগল মানুষের কাছে অস্তিত্বের দাম কি? যে অস্তিত্বের কথা সোনা নতুন করে জানতে পেরেছে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তার গোড়ায় কি জল দেওয়া যায় শুধু বাঁচার আকাঙ্ক্ষার মারফত? আর পানুদাকে না হয় অবজ্ঞা করা যায় রাস্তার পাগল বলে কিন্তু আমার অফিসের শ্যামবাবু যে খালি ভাউচার লেখে আর মোটা হয় সে যে আমার বুকে চেপে বসে। শুধুমাত্র বাঁচার প্রতিভূ তো আমাদের অফিসের শ্যামবাবু।

সোনার কথায় আমার কিন্তু কৌতূহল বেড়ে যায়। সে যে বলেছিল অসাধারণ লোক যদি চারদিকে গিজ গিজ করে তাহলে দম আটকে আসে সে কথা আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নি। আমি আবার নতুন করে নিজেকে সমালোচনা করি। হয়ত সে ঠিকই বলে কারণ পৃথিবীর পঁচানব্বইটা লোকই আসলে শ্যামবাবুর মতো। তাদের সমস্যা নেহাত বাঁচা। সেই পঁচানব্বই জন শ্যামবাবু রাজা অশোকের যুগে ছিল, সেক্সপীয়রের যুগে ছিল এমন কি এই সেদিনের কথা রবীন্দ্র-নাথের যুগেও ছিল। যে কোন আর্থিক কাঠামোতেই শ্যামবাবুরা থেকে

যাবে। তারা হয়ত ঠিক এভাবে পা দুলিয়ে দুলিয়ে ভাউচার লিখবে না তবে ঐরকম একটা কিছু করবে। আর শ্যামবাবুদের জীবনই হল মানুষের জীবন। পাঁচটা অতিমানুষের কার্যকলাপ তো সারা মানব-সমাজের আসল চেহারা নয়।

যুক্তির দিক থেকে কথাগুলো সত্যি হতে পারে কিন্তু ভাবতে বুক একটু দমে যায় বৈ কি। শ্যামবাবু আমাদের অফিসের বড়বাবু। চৌত্রিশ টাকায় ঢুকে এখন নানাদিক থেকে হাতিয়ে বাগিয়ে প্রায় চারশো টাকা রোজগার করেন মাস গেলে। এর ওপর তিনি আবার রহস্য সিরিজের লেখক। তাঁর "বিভীষিকার রাত্রি" এবং "যমের ডাক" বইকখানার কয়েক সংস্করণ হয়ে গেছে।

আমি অবশ্য বড়াই করে বলছি বটে কিন্তু আমার সঙ্গে শ্যামবাবুর তো খুব একটা তফাত নেই। শুধু একটু তফাত—আমি চাই অন্য মানুষের মধ্যে আর একটু চাওয়া বেঁচে থাকুক। আমার ভাবনা সোনার মতো মানুষ যেন আমাদের মতো একেবারে লেপাপোঁছা না হয়ে যায়। আমার মনে হতে থাকে সোনা যদি তার বাঁচার একান্ত তীব্রতায় জীবনের কাছে আরও দাবী করে তাহলে আমি নিজেকে বিপন্ন করেও তার পাশে এসে দাঁড়াব। আর যদি দেখি সেও আমার মতো হিসেব করছে, তার কেবল লক্ষ্য হয়েছে একটু মাত্র স্বাচ্ছন্দ্য তাহলে স্রেফ কেটে পড়ব। সে কিংবা তার বাড়ির লোকজন তাদের সৌজন্য ও প্রীতি দিয়ে আমায় বাঁধতে পারবে না।

সোনার সঙ্গে সে রাত্তিরে আলাপ হবার পর থেকে আমি শ্যামবাবুর প্রতি আরও আকৃষ্ট হলাম। কারণ শুধু বাঁচা আর কিচ্ছু না, এর জন্যে চেষ্টা করা বোধ হয় শ্যামবাবুর চেয়ে আমায় কেউ বেশী শেখাতে পারবে না। ভদ্রলোক আমাদের হলঘরে এক কোণায় বসেন। তিনি যা

পাঠান তার ওপর এ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব দুচারটে ইংরেজী কথা এদিক ওদিক করে দিয়ে সই মেরে দেন। আগে কয়েকবার নিজেই যেচে আলাপ করেছেন কিন্তু তাঁর মোটা থস্‌থসে চেহারা আমায় বিরূপ করেছে। সোনার সঙ্গে আলাপের পর আমি এক নতুন উৎসাহে শ্যামবাবুর দিকে এগোলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি গা করলেন না। বরং একটু সন্দেহের চোখে আমার চালচলন লক্ষ্য করছেন মনে হল। আমি আমার কায়দা বদলে ফেললাম, খানিকটা উদাসীনভাবে, একটু বিরক্তি দেখিয়ে আলাপ স্থরু করলাম। তাতে কাজ দিল। সেই সন্দেহভাব কেটে গেল।

অন্তরঙ্গ হবার স্থযোগও মিলল। আমাদের কোম্পানির একটা ওষুধ বাজার থেকে তুলে নেবার জন্যে সরকারের এক অর্ডার আসছে খবর পেয়ে আমাদের সাহেবরা বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সাধারণত এরকম হয় না। তবে কোন হাসপাতালের এক ছোকরা ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেছে যে ওষুধটা মোটেই কার্যকরী হচ্ছে না যে রকম বিজ্ঞাপনে দাবী করা হয়েছে। এদিকে অনেক টাকার মাল জমা হয়ে আছে। এ অবস্থায় যদি বাজার থেকে ওষুধ তুলে নিতে হয় তাহলে ডাহা মার খেতে হবে। এসব ব্যাপারে কথাবার্তা চালাতে মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে। এবারেও পড়ল, সাহেবরা তাঁদের বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে আমায় ডাকছেন ভেবে বেশ আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম। অবশ্য ব্যাপারটা খুব কঠিন হয় নি। এ বিষয়ে যিনি কর্তা সেই অফিসারটি আমাদের পাড়ার লোক। তাঁর কাছে কয়েকদিন গিয়ে 'দাদা দাদা' করে, পারিবারিক গল্প ফেঁদে, শেষকালে ভদ্রলোককে সস্ত্রীক একটা ডিনার খাইয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করে দিলাম।

আমার অফিসে সম্মান বাড়ল। ইনক্রিমেণ্টের লিষ্টে বোধহয় একধাপ এগিয়ে গেলাম। শ্যামবাবুর চোখ এড়াল না। একদিন ছুটির মুখে আমাকে নিজেই ডেকে বললেন, "বেশ বেশ, এই তো চাই। এখন যদি দৌড়দৌড়ি না করবেন তাহলে করবেন কবে?"

আমি বললাম, "তা শ্যামবাবু, দৌড়দৌড়িই করি আর আপনাদের মতো বসে বসে ভাউচারই লিখি, সবই তো এক ব্যাপার।"

শ্যামবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মানি। 'মানির' মতো এ্যাডভেঞ্চার পৃথিবীতে আর কিছু নেই।"

"চাকরিতে আবার এ্যাডভেঞ্চার কি শ্যামবাবু। একটু বেশী তেল দিলে একটু বেশী ইনক্রিমেণ্ট, এই তো।"

শ্যামবাবু ভাউচারগুলো সামনে থেকে সরিয়ে আরও কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুকে পড়ে বললেন, "হ্যাঁ স্যার, এ্যাডভেঞ্চার আমারও ছিল। এখন সেদিকে তাকাতে ভয় লাগে।"

শ্যামবাবুর কথায় আমি থমকে দাঁড়াই। আমার ভেতর ডনকুইক্সোট প্রীতিটা নড়েচড়ে ওঠে। একবার ভাবলাম হয়ত বাইরে থেকে লোকটার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে বসেছি। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম তাঁর দিকে। বছর চল্লিশেক বয়সী লোকটার হাঁটাবসার মধ্যে এমন একটা জবুথবু ভাব এসে গেছে যে অসোয়াস্তিই হয় তাঁর দিকে তাকিয়ে। ঠিক এইমাত্র মনে হচ্ছিল লোকটা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেই কোমর থেকে ধুতি খসে যাবে। বেঁটে নাকটার মাথায় নস্যির গুঁড়ো লেগে আছে। বড় বড় চোখ কিন্তু একেবারে ভাবহীন, বলা যেতে পারে ড্যাবডেবে। এই লোকটা যখন এ্যাডভেঞ্চারের কথা বললে তখন সত্যিই অবাক হলাম।

শ্যামবাবু বললেন, "বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি, তবে ভূতের পেছনে না,

মেয়েমানুষের পেছনে না, চোর ছ্যাচোড়ের পেছনে না। 'মানি' স্যার 'মানি', টাকার এ্যাডভেঞ্চার।"

হেসে বললাম, "গুপ্তধন খুঁজছিলেন নাকি?"

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, "গুপ্তধন, সে ধন একেবারে চলে ফিরে বেড়ায়। চার চারটে ঠ্যাং।"

এবার আমার মনে পড়ল। যখন প্রথম অফিসে ঢুকেছিলাম তখন শ্যামবাবুর টেবিলে বিস্তর রেসের বই দেখতাম। আর একজন লোকের সঙ্গে বইগুলো নিয়ে সারাক্ষণ গুজগুজ করতেন।

শ্যামবাবু এবার টেবিল চাপড়ে বললেন, "জানেন, ঘোড়া কাকে বলে? যখন জানলাম তখন বেশ কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে। তাও বেঁচে গেছি মশাই, খুব বেঁচে গেছি। এখন ঘোড়া এদিক দিয়ে এলে আমি ওদিক দিয়ে হাঁটি। কি জানি, কোন কথা উঠে পড়বে। যদি সামলতে না পারি।"

একটু অবাক হয়ে দেখলাম একেবারে ভাবহীন মুখখানাতেও একটা ভাব এসেছে। সেটা অনুতাপের না আনন্দের বোঝা গেল না। তবে বেশ বোঝা যাচ্ছিল কোন গুরুতর জায়গায় তিনি নাড়া খেয়েছেন। আজ কথা উঠতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আমি বেরোতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বেরনো হল না। শ্যামবাবু বললেন, "বুঝুন ব্যাপারটা। ছত্রিশ টাকা চার আনায় ঢুকেছি নাইনটিন থারটি-সিক্সএ। আর ভাবুন দেখি, খেললুম টোটে, আর দেড়টাকা দিয়ে পেলুম একশোর ওপর টাকা। আবার খেললুম, আবার টাকা। মনের অবস্থাটা ভাবুন, ভাবলুম চাকরি ছেড়ে দেব। কি হবে এই ছত্রিশ টাকা চার আনায়? এই রাস্তাতেই আমার নসিব খুলবে। সে সিজন একেবায়ে গরম, প্রায় সাতশো আটশো টাকা

এসে গেল। খালি ভাবছি এইবার চাকরি ছাড়ব, এইবার চাকরি ছাড়ব।"

শ্যামবাবুর চোখ দুটো উত্তেজনায় অন্যরকম দেখাচ্ছিল, তাদের ভাবহীনতা অনেকখানি কেটে গিয়েছে। মুখে চাপা বিদ্রূপের হাসি ফুটেছে। এতদিন পরে দেখলাম তাঁর ঠোঁটদুটো খুব লাল, ছোট বাহারে দাঁতের পাটি।

শ্যামবাবু বলে চললেন, "তখন খালি ঘোড়া ভাবছি। এ ঘোড়ার চাল কি রকম, ও ঘোড়ার চাল কি রকম। দিনরাত এই করছি। শনিবার অফিসে আসা বন্ধ করলুম। পরের সিজন এল। পাঞ্জাবির পকেটে করকর করছে নোটের তাড়া। 'বুকি'দের সঙ্গে আলাপ করছি, ঘোড়ার চাল দেখছি। সব ঠিক। আরও টাকা জোগাড় করলুম। খেলতে খেলতে যে টাকা এসেছিল সব ফুরিয়ে গেল। আরও টাকা ধার করলুম, সে টাকাও গেল। মা বুঝতে পারলেন আমায় ঘোড়ার রোগে ধরেছে। বুঝে অমনি কিক্ করলেন।"

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই দেখি শ্যামবাবুর চোখ জলে ভরে এসেছে, অথচ মুখে সেই বিদ্রূপের হাসি।

বললেন, "হ্যাঁ, লাথি। ঠিক লাথি মারলেন মা। বললেন, "দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। তোমার বউ নাও, ছেলে নাও, বেরিয়ে যাও। আর সেই যে বেরিয়েছি আর ফিরি নি। কতবার এমনি গিয়েছি। নাতি-নাতনীদের সঙ্গে, বৌয়ের সঙ্গে কথা বলেন মা। কিন্তু আমার সঙ্গে একটাও কথা না।" কিছুক্ষণ থেমে বললেন, "আমি অবশ্য আমার অংশটা ঝেঁপে দিলুম।"

"তার মানে ?"

"মানে বাবা সবে মারা গেছেন। দুভাইয়ের মধ্যে আমিই বড়।

'আনডিভাইডেড' প্রপার্টি। দালালরা এসে বললে, কিছু ভাববেন না স্যার, আমরা সব ঠিক করে দেব। আমি বললাম, কি একটা আইন হয়েছে না বিধবাদের স্বত্ব নিয়ে।' দালালরা বললে, ওসব আইন জানা আছে স্যার, আপনি একটা খালি সই মেরে দিন। আমার মনে হল যেন ভগবান স্বয়ং দালালের মূর্তি ধরে নেমে এলেন। এক থোকে হাজার টাকার করকরে নোট আমার হাতে তুলে দিল লোকটা। সেই টাকা নিয়ে মাঠে গেলাম। খেললাম। কয়েকটা শনিবার কোনদিক দিয়ে উড়ে গেল। প্রতিবারই ভাবছি এই আসছে টাকা। আর প্রতিবারই একেবারে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মা যখন জানতে পারলেন তখন বাড়ির বড় অংশটা মারোয়াড়ীর কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। মা অবশ্য আমার কাছ থেকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন আরও টাকা দিয়ে। তবে তার আর উপায় ছিল না।"

এবার চেয়ারে পিঠ টান করে দিতে দিতে বললেন, "নাঃ, মা ঠিকই করেছিলেন। মা বুঝতে পেরেছিলেন, আর কিছুদিন গেলে সমস্ত বাড়িটাই ঝেঁপে দিতুম। তখন বউএর সব খিঁচে দিয়েছি, আর কিছুদিন চললে তলে তলে মা-রটাও খিঁচে দিতুম। কিন্তু কি আশ্চর্য জানেন, এখন আমার অন্যদিকে ইনকাম্ আছে। সব মিলে শ চারেক আন্দাজ রোজগার করি। এখন যদি দুশো টাকাও তুলে দিই মার হাতে তাহলেও মা মুখ তুলে তাকাবেন না। আর যদি তখন মাসে তিরিশটা টাকা এনে দিতাম তাহলে ভাতপাতে দুধ আসত। এরকম শুনেছেন কখনও?"

আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে তখন আর একজনকেও দেখতাম, তিনিও কি আপনার মত ডুবেছেন নাকি?"

"দূর? জুয়াড়ীরা কখনও ডোবে নাকি? তারা সব সময় অপ্টিমিষ্ট! সব সময় বলে, জিতছে। জিতছে কি তাতো আমি জানি। যখন খুব মার খায় বলে, 'সমান সমান।' মানে হারজিত কোনটাই নেই। না মশাই, খুব বেঁচে গেছি। কি ভাবে যে চলে গেল এতগুলো বছর। কটা বছর খেললুম আর বাকী কটা বছর তাই ভেবে বম্ মেরে বসে রইলুম।"

পাশের পার্টিশনের দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বললেন, "ঘোড়া এদিক দিয়ে গেলে আমি এখন ওদিক দিয়ে হাঁটি।"

কয়েকদিন পর বিকেলের দিকে বেড়াতে গিয়েছি সোনার বাড়ি। গরমে ফুল ফুটতে শুরু করেছে। রাস্তার ওপর ঝুঁকে আছে এমনি একটা গাছের হলুদ ফুল হাওয়ায় ঝরে ঝরে পড়ছে। কয়েকটা কমবয়সী ছেলে ফুটবল শট্ অভ্যাস করছে আর শট্ মারার পরই পাশের বাডির এক জানলার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে। সোনাদের বাড়ির দরজা ভেজানো! ঠেলতেই সোনার বৌদি মুখ বার করলেন। আমি বললাম, "সোনা আছে?" বৌদি আমার দিকে একনজর তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ভেতরে যাও।"

চৌকাঠে পা দিয়ে আমি থমকে দাঁড়াই। দাদামণি আবৃত্তি করছেন। গলার অমন তীব্র আবেগ আগে কখনও শুনি নি। আমি চৌকাঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকি। দাদামণি আবৃত্তি করছেন: "ঘট কি কখনও জিজ্ঞাসা করতে পারে কেন তার আকৃতি এমন হয়েছে। আমারাও জিজ্ঞাসা করতে পারি না প্রভু। আমাদের জন্মমৃত্যু যে তোমার হাতে।"

আমি আচ্ছন্ন হয়ে শুনতে থাকি। দাদমণির গলা কাঁপতে কাঁপতে

একেবারে ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঠে আরও ওপরে যে আকাশ আমি দেখতে পাচ্ছি না সেদিকে ছড়িয়ে যায়। আমি উঁকি মেরে একবার দেখি। সোনা শুয়ে আছে খাটের ওপর। মুখটা সব দেখা যাচ্ছে না। মা আর মিনু দাঁড়িয়ে আছে ঠায় কাঠের মতো আর দাদামণি মাথার কাছে প্রার্থনা করছেন। মনে হল এ তাঁর একান্ত নিজের প্রার্থনা, এ প্রার্থনা কোন বইএ নেই।

"আমি যখন তোমার সৃষ্টির দিকে তাকাই তখন আমার আনন্দ ধরে না। এই সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-খচিত আকাশ, এই অনন্ত মহাসমুদ্র, এরই মাঝে এত ছোট্ট মানুষ, তুমি কেন তাকে দয়া করলে ? তুমি তো তাকে দয়া করেছ। তুমি আবার আমার ভাইকে দয়া কর প্রভু।"

আর দাদামণির সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দেখি মিনু আর মা-ও যোগ দিয়েছে তাদের গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোচ্ছে না কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাদের এক অবিরল আর্তনাদ ঘর ছাপিয়ে রাস্তায় এসে পড়ছে।

হঠাৎ দেখলাম সোনা নড়ে উঠল। তার গলার আওয়াজ পেলাম, "তোমার যীশু কোন কম্মের না দাদামণি, কোন কম্মের না। তুমি এখান থেকে যাও।" তারপর সে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। এবার তার সমস্ত শরীরখানা যেন আমি আলাদা আলাদা করে দেখতে পেলাম। তার চওড়া বুকখানা হাপরের মতো উঠছে আর পড়ছে। তক্তাপোষখানা ছোট হওয়ায় পা দুটো বেরিয়ে আছে। হাত দুটোর আঙ্গুল মুঠো হয়ে আছে। সমস্ত মুখখানা ফোলা বিবর্ণ।

দাদামণি এবার হাঁটু গেড়ে বসলেন। তাঁর চোখ বন্ধ আর প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহখানা দুলতে থাকে। "আমি এর সমস্ত পাপ আমার মাথায় নিচ্ছি প্রভু। তুমি একে মুক্তি দাও, এর ভবিষ্যতকে

মুক্তি দাও। এ রক্তক্ষরণ বন্ধ কর প্রভু। তুমি তো আমাদের জন্ম দিয়েছ, আগুনের তাপে আমাদের দগ্ধ করেছ, স্বপ্নভঙ্গ এনেছ আমাদের অন্ধকারময় অস্তিত্বে। তুমি জাগো, কথা বলো। আলোর দিকে হাত বাড়িয়েছে যে তরুণ তার দুচোখের সামনে থেকে কেন আলো সরিয়ে নেবে? আমার কোন অভিযোগ নেই প্রভু। তুমি তোমার অবিরল কৃপার ধারায় আমাদের অভিষিক্ত কর।"

আমিও চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখ খুলতেই দেখি দাদামণি বেরিয়ে গেছেন। আমি আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম।

খাটের কাছে আসতেই সোনা একবার চোখ খুলল। তার গলা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার হল। আঙ্গুল দিয়ে একবার নিজের মুখের দিকে দেখিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে চোখ বন্ধ করল।

সোনার মা বললেন, "ওর কথা বলতে মানা।"

সোনা আবার চোখ খুলল। ঠিক আহত জন্তুর মতো দেখাচ্ছিল তার চোখের দৃষ্টি। সে যন্ত্রণা এমন বিরাট এবং ভাষাহীন যে আমিও সে দিকে চেয়ে জড়পদার্থ বনে যাই। একবার সে ঠোঁট খুলবার চেষ্টা করল কিন্তু আঠা দিয়ে তার ঠোঁট যেন কেউ জুড়ে দিয়েছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। একটু হাসবার চেষ্টা করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। একটু পরে সোনার মা বেরিয়ে আসতেই আমি বললাম, "সোনাকে যদি কোলকাতার বাইরে কোন স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো ঠিক করেন তাহলে আমি তার সমস্ত ভার নেব।"

সোনার মা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে আমার দিকে তাকালেন। সে ভঙ্গীতে বিস্ময় না বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ পেল ধরতে পারলাম না।

তাঁর তীক্ষ্ণ মঙ্গোলীয় চোখ দুটো আমায় যেন আপাদমস্তক চেখে দেখছে আর চাপা ঠোঁটের পাশ দিয়ে এমন একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল একটু পরে যে আমার অতি ভয়ানক লাগল সে মুখ।

আমি আমার কথাটা ব্যাখ্যা করে বললাম, "ঠাণ্ডায় হয়ত সোনার শরীরটা আরও তাড়াতাড়ি সারবে। ভাওয়ালি কিংবা "

আমার কথা শেষ হবার আগেই সোনার মা গম্ভীরভাবে বললেন, "তার এখন দরকার হবে না। তবে তুমি যে কোন কালে একথাটা বলেছ তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

তারপর ট্রাঙ্ক থেকে লম্বা একটা লেফাফা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "সোনার বুকের ছবি এসেছে। ডাক্তার বলেছে সামান্য একটু জায়গায় একটা ক্ষত আছে।"

আমি সেই অল্প অন্ধকারে অনভ্যস্ত চোখের সামনে সোনার বুকের ছবিখানা খুললাম। আমাদের মতো সাধারণ চোখে দেখবার কিছু নেই। সোনার মা আঙুল দিয়ে দেখালেন বাঁ দিকে একটা মোটা মতো কালো দাগ। আমি এক্স-রে প্লেটটা হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে জানালার পাশে এসে বসি। বিকেল হয়ে এসেছে। ছেলেরা পরম উৎসাহে বল পিটছে। একজন রানার ধীরে মাপা চালে পার্কটা দৌড়চ্ছে। এক কোণে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলায় মত্ত। তার মধ্যে একটা ডগ্‌ডগে লাল ফ্রকপরা মেয়ে বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। বড়দার ছেলে বাঘা একটা বাখারি দিয়ে গরুর ল্যাজে খোঁচা মারছে। মাঝে মাঝে হাওয়ায় ফুল ঝরছে পার্কের কোণে।

কিছুদিন আগে সোনা যে বাড়িটা দেখিয়েছিল তার মাথায় এখনও তারা ওঠে নি। দেখলাম তার দোতলার বারান্দায় অনেক লোক জমেছে। তাস খেলা চলছে মনে হল।

দাদামণির প্রার্থনার লাইনগুলো আমার কানে ভেসে আসে : "এই সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রখচিত আকাশ, এই অনন্ত মহাসমুদ্র, এরই মাঝে এত ছোট্ট মানুষ।" এক্স-রে প্লেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে আমি এখন সোনার কথার মানে বুঝতে পারি। সব মানুষ যদি তার মতো ভাবতে পারত তারা মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তাহলে তাদের সম্ভাবনার রাস্তা আরও প্রশস্ত হত। অথচ সমস্ত কথাই মানুষ চিন্তা করে, উদ্বিগ্ন হয়, মাথা খোঁড়ে। কিন্তু খুব একটা প্রয়োজনীয় কথা জোর করে তার চিন্তার আড়ালে রাখে। সোনা বলেছিল একদিন, "আমি আগে বুঝতাম না এখন বুঝতে পারি আমাদের বাঁচার কি সম্ভাবনা। কখনও আমরা ভাবি না যে আমরা বিরাট শূন্য থেকে এসে আবার এক বিরাট শূন্যে মিশে যাব। এ বিষয়ে কোন তর্কই হতে পারে না। আর এরই মাঝখানের এই পঞ্চাশ কি ষাটটা বছর জড় পদার্থের মতো বেঁচে কোন লাভ নেই। বাঁচতে হবে অগ্নি হয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে দেশকালের ওপর প্রভাব ফেলতে হবে।"

আমি বলেছিলাম, "মৃত্যুর কথা ভেবে তো আমাদের দেশের লোক সন্ন্যাসী হয়েছে, হিমালয়ে গিয়েছে।"

সোনা বলেছিল, "মৃত্যু আমার কাছে ঠিক উল্টোভাবে আসে। সিঁড়ি ভাঙ্গতে গিয়ে আমার বুকে হাঁফ ধরে, চোখে অন্ধকার দেখি। তারপর রাস্তায় নেমে এসে লোকগুলোকে দেখে মনে হয় ডেকে ডেকে আলাপ করি। নিজের ব্যবহারে যাতে সামান্য অসৌজন্য না থাকে তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি।

একটা কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ি রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল। নিকষ কালো চেহারা এক ধাঙ্গড়ের ছেলে, সর্বাঙ্গে তার রাস্তার পাঁক, সেই ময়লা গাড়ির এক কোণেই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তার কাঁধের

খাঁচাটা চওড়া তবে এখনও মাংসে ভরে ওঠে নি। হয় তো ভরে উঠবার সময় কখনও পাবে না। কাত হয়ে শুয়ে থাকার দরুন বোধহয় গলার রগটা ফুলে উঠেছে আর তার কাদামাখা নিটোল বুকখানা উঠছে পড়ছে গভীর ঘুমের নিঃশ্বাসের তালে তালে। আমি এক্সরে প্লেটে সোনার ফুসফুস দুটো দেখি আর সেই ধাঙ্গড় ছেলেটার বুকের দিকে চেয়ে থাকি। কতখানি কাছের এই দুটো লোক। একই তো সেই রক্তের তরঙ্গ মুহূর্তে মুহূর্তে ছলকে উঠছে দুটি প্রাণীর হৃদযন্ত্রে, একই ভাবেই এই ভূমণ্ডলের বায়ুতে ভরে উঠছে তাদের বুক। অথচ কত দূরের লোক তারা। পার্কের রেলিংয়ের ধারে যে সাদা লালে মেশা কুকুরটা ল্যাজ নাড়ছে তার সঙ্গে সোনার যা পার্থক্য এ ধাঙ্গড় ছেলেটার সঙ্গে তার চেয়ে তার কম পার্থক্য নয়।

এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি সোনা কালু বেড়ালটার মৃত্যুতে কেন এত অভিভূত হয়েছিল। আমি হলফ করে বলতে পারি এই যে আমার সামনে পুরুষ্টু কুকুরটা নিবিষ্ট মনে গা চাটছে তার কাণ্ডকারখানা দেখে সোনা রোমাঞ্চিত হবে। কারণ সে দাঁড়িয়ে আছে যে লয়ের সামনে তার শব্দ নেই গন্ধ নেই স্পর্শ নেই। তার আরম্ভ নেই শেষ নেই। যার সামনে দাঁড়িয়ে এই ছোট্ট পার্কটাকে অসম্ভব সমারোহে শোভিত মনে হয়, এখানকার প্রত্যেকটা ঘাসের ডগা কথা বলে। আর যে ছেলেটা ব্যাটবল লাগা মাত্রই রান করবার জন্যে দৌড়চ্ছে তার কাণ্ডকারখানা এই ঘাস গাছপালা পশুপাখীর সঙ্গে মিশে এক প্রকাণ্ড অর্থময় সঙ্গীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সম্ভাবনাহীনতা কমবয়সী অনেক ছেলেমেয়েদের প্রাণ কুরে কুরে খাচ্ছে তার হাত থেকে সোনা বেঁচে গিয়েছে। দাদামণি যা বলছিলেন তা তিনি নিজে বিশ্বাস করেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু সোনার

প্রসঙ্গে এ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সে বাঁচার চিরন্তন ট্রাজেডির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমনভাবে যা অনেক লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার খোলা রাস্তা আর সম্ভাবনা-হীনতার বন্ধ দরজাগুলো একই সঙ্গে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। এই বন্ধ দরজার কারণ একমাত্র দেহগত। একবার সে যদি কাদামাখা ধাঙ্গড় ছেলেটার মতো তাজা দুটো ফুসফুস পায় তাহলে তার সামনে কোন দরজাই বন্ধ থাকবে না। সমস্ত অস্তিত্বকে সে এক গানের তরঙ্গের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের দিকে। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে সব হিসেব করে কিংবা করতে বাধ্য হয় সে সব হিসেবের অনেক উর্ধ্বে সে বাস করে। সে সত্যিই এক সূর্যচন্দ্রনক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা বলছে এক অনন্ত মহাসমুদ্রের তীরে।

চার

মাসখানেক কেটে যাবার পর একদিন সোনার মায়ের চিঠি পেলাম ঃ

“প্রত্যেক মা-ই চায় তার সন্তানকে বাঁচাতে তার নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। আমার সোনাকে যদি বাঁচাতে পারতাম সেভাবে দ্বিধা করতাম না। কিন্তু রোগের আক্রমণ থেকে রোগীকে বাঁচাতে শুধু মায়ের প্রাণই যথেষ্ট নয়। তোমার কাছে চিঠি লেখবার আগে আমি সারারাত ভেবেছি। বিশ্বাস কর, আমি এভাবে কাউকে চিঠি লিখি নি। আশা করি তুমি বুঝবে। সোনার অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল। উপযুক্ত ওষুধ আর বিশ্রাম পেলে কোন বিপদ নেই। আপাতত বাইরে পাঠানোর কোন প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু খরচ হয়ে গিয়েছে। আরও হবে। তার ওপর সোনা এবার তিনবছর বাদে আবার পরীক্ষা দিতে বসছে। এবার যদি সে পরীক্ষা দিতে না পারে তাহলে তার মন ভেঙ্গে যাবে। তাকে বাঁচানো আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তুমি অবিলম্বে দুশো টাকা জোগাড় করে পাঠাবে। আমি এ টাকা কোনদিন শোধ করব এ প্রতিশ্রুতি তোমায় দেব না।”

সেদিনই আমি টাকাটা জোগাড় করে সোনার বাড়ি দিয়ে এলাম। রাত্তিরে স্বপ্নে দেখলাম সোনাকে। সে শুয়ে আছে তার চৌকিতে চিত হয়ে। সারা গা আগুনের আভায় লাল হয়ে আছে। সোনার

মা তাকিয়ে আছেন তাঁর মঙ্গোল চোখ মেলে একদৃষ্টিতে তাঁর ছেলের দিকে। সে চোখে বেদনা নেই, বরং মৃত্যুকে তিনি যেন ভেঙাচ্ছেন তাঁর বিদ্রূপ দিয়ে, তাঁর সমস্ত জীবনের জ্বালা দিয়ে। বাঘা ঘুমের ঘোরে কথা বলছে, মিনু কাঁদছে। আর বাইরের ঘরে আড়াল থেকে আমি যেমন শুনেছিলাম একদিন ঠিক তেমনি ভাবে বৌদিকে বড়দা আদুরে গলায় বলছেন, "দাও না গো পিঠটা চুলকে, এমন ঘামাচি উঠেছে।" তারপর কেমন করে পার্কের গাছটা উঠে এল সোনার মাথার কাছে। ঝরকে ঝরকে ফুল ঝরতে শুরু করল সোনার উত্তপ্ত গায়ে মাথার চুলে। একটা শাঁখের আওয়াজ ভেসে এল। মিনু চেঁচিয়ে উঠল, "মুখুজ্জেদের ছেলে হল।" আমি অন্ধকারে পার্কটার বেঞ্চিতে বসে আছি। আর আমার চোখের সামনে ভাসছে সোনাব শরীরখানা। এমন শরীর আমি কোনও আধুনিক ছবিতেও দেখি নি। গনগনে আগুনের আভায় তার সারা শরীর লাল হয়ে আছে।

সোনার মায়ের দ্বিতীয় চিঠিতে যখন জানলাম তাঁর ছেলে অনেকটা ভাল, এমন কি উঠে চলে বেড়াচ্ছে, হাসপাতালের আউট-ডোর ওয়ার্ডে গিয়ে এ. পি. নিয়ে এসেছে, রাত্তিরে গরমে ঘুমোতে সামান্য অসুবিধে হওয়া ছাড়া এমনি ভালই আছে, মাথা ভারী নেই, ক্ষিধেও বেশ হচ্ছে ইত্যাদি, যখন জানতে পারলাম যে মৃত্যুর বিরাট রহস্যটা আর দাঁড়িয়ে নেই তার দরজার গোড়ায় তখন সত্যি বলতে কি কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার উদ্দীপনার অভাব ঘটল। কারণ উদ্দীপনা ছাড়া আর কি! সোনার নতুন করে রোগে আক্রান্ত হবার পর থেকে আমি আমার নিজের বদ্ধ সম্ভাবনাশূন্য জগতে বাস করেও এক নতুন দিগন্তের দিকে চোখ ফিরিয়েছি। সোনার কালু

বেড়ালটার মতো রাস্তায় পোকা মাকড় থেকে আমার অফিসের শ্যামবাবু এমন কি যাদের সঙ্গে কথা বলতে বিরক্ত হই তারাও আমার সামনে এক অচ্ছেদ্য পংক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রত্যেকের শরীরে রক্তের তরঙ্গ উঠছে পড়ছে। তাদের নিঃশ্বাসে বুক ভরে উঠছে, খেয়ে অপরিসীম সুখ হচ্ছে। সজোরে অস্বীকার করলেও আমিও সোনার মতো কিছুটা ভাবতে শুরু করেছি যে এই বাঁচা, এই শোওয়া বসা খাওয়া ঘোরাফেরা এর পেছনে যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাও থাকে তাহলেও এটা এক মহা আনন্দের ব্যাপার। এই সব সামান্য ঘটনা যেমন স্নান করে শরীর শীতল করা দুপুরে ঘামে কষ্ট পাওয়া, সন্ধ্যের হাওয়ায় গা জুড়নো—এই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো প্রত্যেকের কাছেই এক বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে। রাস্তায় মাতাল আর পুরুষসিংহ এই দুজনেরই সেই একই প্রাথমিক সমস্যা অর্থাৎ বাঁচা। আর সোনার পানুদা পাগল হোক কিন্তু সে বেঁচে আছে, সেই জন্যেই তার সম্ভাবনা। মানুষের একমাত্র প্রশ্ন মৃত্যু যার কোন উত্তর নেই। এমন একটি ঘটনা যা রক্তের সমুদ্র শান্ত করে দেবে, নিশ্বাস বন্ধ করে দেবে, শব্দস্পর্শঘ্রাণশূন্য এক জড় পদার্থে দাঁড় করাবে মানুষকে। আর সেই ঘটনার ওপর কোন কথা থাকবে না। আমার মনে হয় যে কোন কারণেই হোক না কেন মানুষের মঙ্গল সাধনায় কিছু পরিমাণে খাদ থেকে যাবেই। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি একেবারে বাদ দেওয়া অসম্ভব। কেবল মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েই সম্ভব একেবারে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে মাত্র বাঁচার প্রতি প্রবল আকর্ষণেই মানুষের হিতসাধনা করা।

কথাটা শুনতে আশ্চর্য লাগলেও আমার বলতে লজ্জা নেই, সোনার মৃত্যুর সম্ভাবনা আমার বদ্ধ ঘরে বাতাস খেলিয়ে দিল। তাই সোনার মায়ের যখন চিঠি পেলাম তখন খুব খুশি হতে পারলাম না। একেবারে

ভাল হয়ে যাবার পথে সে চলে গিয়েছে অর্থাৎ তার সামনে আর সেই অনিশ্চিতি নেই যা এই নিশ্চিত সীমাবদ্ধ জগতের সীমা অনেক দূর পর্যন্ত বাড়াতে পারে—এ সংবাদ আমায় আনন্দ দিল না।

বেশ কিছুদিন বাদ দিয়েই সন্ধ্যেবেলা সোনাদের বাড়ি গিয়েছি। ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাঃ, টাকা পাঠিয়েই খালাস।"

আমি বললাম, "কেন, একটা টেবিল ফ্যান্ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তো। পান নি?"

"হ্যাঁ পেয়েছি। তবে তার কোন দরকার ছিল না। সারারাত পাখা করবার অভ্যেস আছে। তাছাড়া ফ্যান্ পাঠিয়ে দিলেই তো সম্বন্ধ চুকে যায় না। তোমার ফ্যান্ পড়ে আছে ত্যাখো গিয়ে।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "বুঝলাম দোষ করেছি আসি নি বলে। কিন্তু ফ্যান্টা কি দোষ করল? আপনিও দেখছি আপনার মেয়ের মতো কথা বলছেন।"

সোনার মা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ত্যাখো অত বেশী তুখোড় কথা বলো না, আমার রাগ হয়। তোমার সঙ্গে আমার কোথায় একটা মিল আছে জানো। আমারও সমস্ত মন জুড়ে এমন একটা ঠাণ্ডা ভাব আসে যে সব ব্যাপার থেকে নিজে দূরে চলে যাই। কিন্তু আমার বয়স হয়েছে। তোমার এসব হবে কেন? তোমায় সত্যি বলছি যদি বাস্তবিক আকর্ষণ বোধ না কর সোনার জন্যে তাহলে দয়া দেখাবার জন্যে এসো না। এ কদিন রোজ সন্ধ্যেবেলা ভেবেছি তুমি আসবে। সোনা বেচারি রকে বসেছিল অনেকক্ষণ তোমার জন্যে সন্ধ্যের পর। আমি তোমার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাই না। তবে যা নিজে বিশ্বেস কর তাই কোরো। মনের অভিনয় অসহ্য।"

"সোনা কোথায় বেরিয়েছে?"

"এ. পি, নিতে গিয়েছে হাসপাতালে। সেখান থেকে আরও কোথায় যাবে। তুমি বস। মিন্টু, তুই এখানে এসে বস। আমি সোনার ওষুধ কিনতে বেরোচ্ছি। কয়েকটা ওষুধ ফুরিয়ে গেছে।"

মা বেরিয়ে যাবার পর মিন্টু দরজার গোড়ায় এসে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে হঠাৎ বললে, "আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন?"

প্রশ্নটা এমন আকস্মিক যে আমি না হেসে পারলাম না। মিন্টু এবার দরজা ছেড়ে দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে বললে, "না, আপনি হাসবেন না। কদ্দিন আর এমনি করে চলবে? আমার এখন না দাঁড়ালে চলবে না।"

বললাম, "চাকরির ব্যাপারে তো জানাশোনা না হলে হয় না। আর আমার তো নিজের অফিস ছাড়া অন্য কোথাও বিশেষ জানাশোনা নাই। যদ্দূর জানি আমাদের অফিসে লোক নেবে না।"

মিন্টু আমার কথা বিশ্বাস করল না। মুখ ম্লান করে বললে, "আপনারা চেষ্টা করলেই হয়। আমি যাকে দেখছি তাকেই বলছি অথচ কেউ একটাও কথা বলে না। রমেন-তো সেই কবে থেকে বলছে, কিন্তু কিছুই করে দিল না।"

আমি অন্য রাজত্বে ছিলাম। মিন্টুর সমস্যা আমায় একটু এলোমেলো করে দিল। বললাম, "দাদা ভাল হয়ে নিক। ততদিন না হয় তুমি পড়।"

মিন্টু ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "আপনিও দেখছি ছোড়দার মতো বলছেন। আমি আর পড়ব না, আমার দ্বারা পড়া হবে না। আমি বিদুষী হতে চাই না। আমায় একটা চাকরি জোগাড় করে দিলেই হবে।"

বেরিয়ে যাচ্ছিল সে এমন সময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ পেলাম। মিনু বললে, "রমেনদা এসেছে," আর তার বলবার সঙ্গে সঙ্গেই রমেন ঘরে ঢুকল।

এসেই সে আমার আর মিনুর দিকে কিছুক্ষণ তেরছাভাবে চেয়ে নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল। বেশ অপ্রস্তুতে পড়লাম। কারণ হাসিটা আরও কিছুক্ষণ ধরে চালালো সে। মিনু বললে, "কি হচ্ছে রমেনদা?"

রমেন আমার দিকে ভুরু নাচিয়ে বললে, "আপনি তো স্যার একজন মহানুভব ব্যক্তি। দুদিনের আলাপেই মাইরি ঝড়াক করে দুশো টাকা ফেলে দিলেন। কেন, মিনুকে পছন্দ হয়েছে বুঝি।"

নিশ্চয় খুব বিমূঢ় লাগছিল আমাকে। আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখেই রমেন বললে, "আপনি চটবেন না স্যার। এ আর চটার কথা কি। তা বলুন, আমি আপনার ঘটক হচ্ছি।"

এতক্ষণ মিনু প্রাণপণে লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করছিল। গম্ভীর হয়ে আবার পরক্ষণেই হেসে ফেলে বললে, "ছিঃ রমেনদা তুমি কী! ওঁর আর চিন্তা নেই যেন।"

রমেন বললে, "কেন, খারাপ কি বলেছি মিনু। তোমার চেহারাটা তো খুব বাজে নয়। তারপর এখন কিছুদিন থেকে বেশ চেকনাই হয়েছ। মেয়েদের আর কি চাই।"

ইতিমধ্যে একটু সামলে উঠেছি। বললাম, "আপনি রমেনবাবু কলারসিকদের কি সব বলছিলেন সেদিন?"

রমেন বললে, "ও, আপনি তা শুনতে চান আবার। আচ্ছা, মিনু একটা মেয়েমানুষ তো। তা আমি কলাটলা জানি না। আমার যদি ভাল লাগে তাহলে বলব, 'মিনু, চলে আয় মাইরি।' আর

একজন যে কলারসিক সে শেলী ফেলী বলে তাকে একেবারে রাস্তায় বের করবে, তারপর মধু ফুরোলে ফেলে দিয়ে হাওয়া।"

মিনু বললে, "দূর, তোমার কি হয়েছে রমেনদা। আর কোন কথাই মুখে আসছে না!"

"আর কি আছে মাইরি বল। রাস্তায় বেরুলে কংগ্রেস আর কম্যুনিস্ট পার্টি, অফিসে কার কত ইন্‌ক্রিমেণ্ট হচ্ছে তাই নিয়ে অশান্তি আর বাড়িতে বসে থাকলে এটা নেই সেটা নেই। এরই মধ্যে একটুখানি সুধা—মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ। এই ত্যাখো সোনার সেই বেলা, কেটে পড়ল তো।"

আমি চমকে উঠলাম। নামটা সোনার মুখে কয়েকবার শুনেছি। রমেন বললে, "এই যেমন ধরুন বেলা বলে ছুঁড়িটা। সোনার সঙ্গে দিনকয়েক খুব ঘুর ঘুর করল। তারপর যখন দেখল সুবিধে হবে না সট্‌কে পড়ল। আমি বাবা সোনার মত শেলী ফেলী বুঝি না। তবে বেলা যে সটকাবে আগেই টের পেয়েছি।"

এমন সময় সোনা এল। রমেনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে আমায় বললে, "পার্কে বসি আয়। ঘরে বড্ড গরম।" কিছুদিন হল আমরা 'তুই'-তে এসেছি। বুঝলাম পেছনে রমেন তার হাসিটা শুরু করেছে।

সোনার দিকে চেয়ে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। তার মুখচোখ খুব স্বাভাবিক। গলার আওয়াজও অবসন্ন নয়। খালি একটু ধীরে হাঁটছে। আমরা পার্কের এক কোণে একটা বেঞ্চিতে বসতেই সোনা বললে, "আজ বড্ড ব্যথা লেগেছে। একটা আনাড়ি স্টুডেণ্ট, তাও এমন হড়বড় করছিল। রক্ত বার করে দিল। আমার আবার এ, পি, নেবার পরই এমন শরীর অস্থির করে।"

আবার তাকে নতুন চোখে দেখলাম। তার আর আমার মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান তা বাইরে থেকে চাপা পড়লেও তা যে কঠিন বাস্তব সে কথা স্মরণ করলাম আর একবার। কোন মুহূর্তে গা ভারী হবে, রক্তের চাঞ্চল্যে পরিবর্তন আসবে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে সেই অনিশ্চয়তা এখনও সরে যায় নি তার সামনে থেকে।

সোনা বললে, "আমরা যা ভয় করেছিলাম তা নয়। আমার যে অসুখটা তা বর্ণনা করতে গিয়ে বাঙলা বইতে সিনেমায় খালি দেখানো হয় রক্ত উঠছে। আমার সে রকম ব্যাপার কোন দিন খুব হয় নি। সেদিন যা হয়েছিল তার সঙ্গে ডাক্তারদের মতে আমার বুকের সরাসরি যোগ নেই। আমার অসুখের কোন রং নেই। অচৈতন্য হয়ে পড়া নেই, খুব জ্বর নেই কিংবা বেশী রক্তপড়া নেই। আমি চলছি ফিরছি ঘুরে বেড়াচ্ছি আর আমি যখন সবচেয়ে ফুর্তিতে আছি তখনও এই শরীরটার কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারি না। এই শরীরটা ঘাড়ে করে আমায় ঘুরতে হচ্ছে। সেই শরীর একটু খারাপ হলেই পুরনো লক্ষণগুলো আবার ফিরে আসে। শরীর ভারী হয়। হাঁটতে গেলে হাঁপ ধরে। আর তখন ভাবি এই চারপাশের এত লোকের কলরবের ভেতরে থেকেও আমি নেই। এ থাকার কি মানে হয়?"

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, "এ থাকার খুব মানে হয় সোনা। তুই যদি সারাজীবন ধরে এই অলক্ষ্যে থাকা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাস তাহলে তোর বেঁচে থাকার এক মস্ত মানে থাকবে। কারণ তুই তো কখনও দেখতে পাবি না মানুষের মন মরে যাওয়া কাকে বলে। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তুই সব সময় তাজা থাকবি, কিছুতেই শুকোবি না। আমি তো বেশীর ভাগ মনই দেখি শুকনো বাসি ফুলের মতো।

পঞ্চাশ ষাটটা বছর এই বাসি ফুলই তাদের শরীরের ডালে সাজিয়ে রাখে তারা। তোর কাছে প্রত্যেকটা সকাল পুরনো হবে না। প্রত্যেকটা সন্ধ্যে পুনরাবৃত্তি হবে না, তুই তো সোনা মস্ত ভাগ্যবান লোক।"

সোনা বললে, "তুই কি বলছিস আমি সারা জীবন আর কিছু না ভেবে শুধু আমার শরীরের চিন্তা করব। তুই তাই চাস?"

"না না আমি তা চাই না। আমি চাই তুই সম্পূর্ণ সেরে ওঠ। কিন্তু..."

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু তুই আজ যত তীব্রভাবে জীবনের দামের কথা ভাবছিস, মুস্কিল হল বহাল তবিয়তে জীবিত থেকে মানুষ সে ভাবনা ছেড়ে দেয়। তুই সুস্থ হয়ে ওঠ কিন্তু শুধু একটি সুস্থলোকই তুই হসনে। আরও একটা কিছু হ।"

আমার শেষ কথা একটু বেশী চেনা ঠেকলেও ঠিক মামুলী ভাবে কথাটা বলতে চাই নি। সোনা আজ যে রকম তীব্রভাবে বাঁচার দাম দিতে প্রস্তুত তেমনিভাবে যদি সারাজীবন প্রস্তুত থাকে তাহলে আমি তার সারাজীবনের সঙ্গী হব। আমিও ভুলে যাব বিরক্তি, প্রতি পদে পদে আমার আচরণে আমি যে লোককে অবজ্ঞা করি, আমি যে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা স্নায়ু অনুভূতিহীন হয়ে পড়ি—সে সমস্ত আচরণ ঝেড়ে পুঁছে ফেলে আবার নতুন হবার রাস্তায় পা দেব। সে সম্ভাবনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমি তার মারফত পেয়েছি।

সোনা কিন্তু আমার কথা শুনে চেঁচিয়ে উঠল, "ওসব কথা আমায় বলিস নে। ওসব খবরের কাগজে ছাপাস। মিটিং-এ দাঁড়িয়ে ওগুলো বক্তৃতা করিস, আমি শুধু সুস্থ লোক হয়ে বাঁচতে চাই। আর কিছু পরোয়া করি না।"

তারপর বেঞ্চির গায়ে পিঠ এলিয়ে দিতে দিতে নিজের মনেই বললে, "একটা চাকরির দরকার, আর চাকরি পেলেই একটা বিয়ে করব। বেলা আর আসবে না, তা হোক। এ পৃথিবীর যে কোন স্বাস্থ্যভরা মেয়ে যদি আমার বৌ হয়ে আসে—সে তামিল তেলেগু হোক, উড়িয়া বেহারী হোক, চীনে জাপানী হোক—আমি ধন্য হব।"

হেসে বললাম, "হবি না, বাড়ি ছেড়ে সটান দৌড় দিবি।"

সোনা বিরক্ত হয়ে বললে, "আমি মিথ্যে বলছি না কি?"

"না তুই মিথ্যে বলছিস না, তবে তুই নিজে এখন অসুস্থ বলে শারীরিকভাবে সুস্থ জীবনকে খুব রং দিয়ে দেখছিস।"

"ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, আমি একেবারে ছক কেটে রেখেছি। চাকরি করব, বিয়ে করব আর বাকী সময়টা যদি আর কিছু করতে না পারি নেহাত বিদেশী ভাষা শিখে কাটিয়ে দেব। এক একটা ভাষা শিখতেই তো তিন-চার বছর কেটে যাবে। পৃথিবীতে এতগুলো ভাষা আছে। এর চার পাঁচটা শিখতেই বিশ বছর কাটিয়ে দেব। বিরক্ত হবার সময়ই পাব না।"

আমি বললাম, "বিরক্ত তুই রোজ হবি। অফিসে কলম পেশার সময়, বৌএর সঙ্গে পারিবারিক খিটিমিটিতে। কিন্তু এই বিরক্তি ছাপিয়েও যদি আর কিছু পাস—"

সোনা চেঁচিয়ে উঠল, "তোর বক্তৃতা থামা, প্লিস্। তোর বইএ পড়া থিওরী আমার ওপর পরখ করলে বেশী সুবিধে হবে না। আমার কাছে বাঁচাটা খুব সিধে ব্যাপার। তোর বইয়ের কথা ছাড়। একবার শরীরটা সারিয়ে নিই না, তখন দেখিস। আচ্ছা, তুই কখনো ভেড়ার ল্যাজ খেয়েছিস?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "না, কেন?"

সোনা হেসে বললে, "কেন আবার, কোন উদ্দেশ্য নেই। চমৎকার খেতে। আর একটু সুস্থ হলে তোকে রেঁধে খাওয়াব। রোষ্ট বানাব। ও বিদ্যেটা আয়ত্ত করেছিলাম। দেখিস, কি চমৎকার খেতে। আর কোন বিশেষণ নেই, খালি চমৎকার। এই পৃথিবীটার মতো।"

রাত্তিরে এ পার্কটাকে আরও বেশী করে বাড়ির উঠোন মনে হয়। সোনাদের বাড়ির আধভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে যে আলোটুকু দেখা যায় সে আলোয় মার শাড়ীর আঁচল, কখনও মিনুর মুখ ভেসে ওঠে। একদিকে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে কতগুলো লোক নিচু পর্দায় আলাপ করছে। ক্লাবঘরখানা থেকে হাসির হররা উঠছে। আবার সেই বাড়িটার ওপর তারা উঠেছে। গ্যাসের আলো পড়েছে একটা ফুটন্ত কৃষ্ণচূড়ার ডালে।

সোনা বললে, "হাসপাতালে চেস্ট ডিপার্টমেণ্টের আউটডোরে কখনও গিয়েছিস? একেবারে নরক। ঢুকতে গিয়ে রোজ দম বন্ধ হয়ে আসে। ঘরে ঢুকে যখন চারপাশে তাকিয়ে ভাবি আমিও এদেরি একজন তখন আমার সমস্ত বোধশক্তি লোপ পায়। আমার চেহারা দেখে কোন কোন রুগীর চোখ টাটায় বোধহয়। আমার আপাদ মস্তক খুঁটিয়ে দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করে। একটা লোক, ঠিক শকুনের মতো হাড়গিলে চেহারা, পরনে ফিনফিনে পাঞ্জাবি, তিন আঙুলে তিনটে আংটি—আমার পাশে এসে রোজ ভাব জমায়। বলে, 'আপনি ভাবছেন সেরে যাবেন, না? ওরকম প্রথম প্রথম সকলেরই মনে হয়। আমাদেরও হয়েছিল। যেগুলোর হাড় পাঁজরা বেরিয়ে গেছে সেগুলো তাও বেঁচে যেতে পারে কিন্তু আপনার মতো মোটা সোটা লোকগুলোর মুস্কিল। বছর না ঘুরতেই দেখি টেঁসে যাচ্ছে।'

আমি একদিন তাকে বলেছিলাম গুলি লেগে ফুসফুস জখম হওয়ার কথা। তাই শুনে সবাইয়ের কি হাসি। একজন বললে, 'ওরকম গুল মারছেন কেন স্যার?' তারপর একজন মেয়েমানুষের গল্প শুরু করল। যে লোকটা গল্প করে তার অবস্থাটা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। তার কথা শুনলে আমার মাথা ঘোরে। সে লোকটা ঠিক করেছে তার জীবনের বাকী কটা দিন বেপাড়ায় কাটিয়ে দেবে। সে যখন তার কীর্তিকলাপ শোনায় আর পাশের লোকগুলো মুখেচোখে ক্ষিধে নিয়ে কথাগুলো গিলতে থাকে তখন আমি প্রাণপণে নিজেকে সামলাই। ডাক্তার আসে নিজের মর্জিতে। রোগীদের লম্বা কিউ। তার মাঝখানে সেই মেয়েমানুষের গল্প।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, "তাহলেই ত্যাখ, তুই অসুখে পড়ে জীবনের জন্যে যতখানি দাম দিতে প্রস্তুত আর সকলে সে রকম নয়। অনেকের কাছে হয়ত বাঁচার বিরক্তি থেকে অসুখটা এক মস্ত বড় পালানোর সুযোগ। আর এই ধরণের লোকগুলো যদি বেঁচেও ওঠে তাহলেও এদের কাছে জীবনের দাম আর কি হতে পারে!"

সোনা বোধহয় অসন্তুষ্ট হল। বিরক্তিমাখানো গলায় বললে, "উঃ আবার তুই তোর থিওরী আওড়াতে শুরু করলি। যে লোকটা বেঁচে আছে সুস্থ শরীরে সে চোর ছ্যাঁচড় হোক, লম্পট হোক, তারও বেঁচে থাকার একটা মানে আছে; তোকে কি করে বোঝাব, যে ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারছে ঘুম থেকে উঠে চাঙ্গা হয়ে গা রগ্‌ড়ে স্নান করছে, দৌড়ে বাস ধরছে তার কি আনন্দ!

"একটা জন্তুও তো তাই করে।"

"হ্যাঁ, একটা জন্তুও, কিন্তু তাতে হয়েছে কি? আর সে যদি জন্তু

না হয়ে ইঁট কাঠ পাথরের মতো পড়ে থাকে, যদি সে একটা জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে তাহলে তোর থিওরী দাঁড়াবে কোথায়? দারুণ দোষ করেছে এমন ফাঁসির আসামী, তারও সব ফুরিয়ে যায় নি। তুই তার ফাঁসি হয়ত সমর্থন করবি কিন্তু আমার কাছে এ বিচার অসহ্য। যে প্রাণ থাকলে বোঝা যায় না, যা তৈরি করতে কেউ পারে নি, পারবে না, সেই প্রাণটাকে নিঃশেষ করা হবে আইন দিয়ে?”

উত্তেজিত হয়ে বললাম, “যে লোকটা অন্যের প্রাণ নিচ্ছে তাকে কি তুই ফুলতুলসী দিয়ে পূজো করতে বলছিস?

“হ্যাঁ পূজো করতে বলছি।”

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, “তোকে অনর্থক বকাব না। তোর সঙ্গে আমার এখানে পার্থক্য থাকবেই। শুধু বহাল তবিয়তে থাকাটা আমার ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তুই শুধু বাঁচবি না, তুই বড় হবি। যে বাঁচার উৎসাহ তোর কথায় আচরণে তাই তুই ছড়াবি তোর চারপাশের লোকের মাঝখানে। নইলে শুধু খেয়ে দেয়ে থাকার অস্তিত্ব আর একটা জড়পিণ্ড—এ দুটোর মাঝখানে আমার কাছে একটুও প্রভেদ নেই, একটুও না।”

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ভাবসাব একটু বেয়াড়া রকমের, এখন আমি তা বুঝতে পারি। আমি বরাবরই ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে বেশী আনন্দ পাই। মেয়েদের ব্যাপারে যে চেষ্টা চরিত্র করি নি তা নয় কিন্তু কিছু দূর এগোনোর পরই আর যাওয়া সম্ভব হয় না আমার পক্ষে। এ জন্যে আমিই দায়ী। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি কোন সমস্যামূলক আলোচনা না হলে আমি উৎসাহিত বোধ করি না। আমার জন্যে তো আর অর্ডার দিয়ে মেয়ে তৈরি হবে না।

সুখের বিষয়, আমার পরিচিতা রমণীগণ সমস্যা আলোচনা না করেও বেশ আছেন এবং থাকবেন। আর মন দেওয়া-নেওয়ার টুং-টাং আলাপে যে সব তরুণ খুব পারদর্শী তাদের তারিফ করলেও আমি তাদের আর্টটা ঠিক ধরতে পারতাম না। আমি লক্ষ্য করতাম অনেক পরে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েও তারা আমায় কেমন মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার ভারী মেজাজ নিয়ে আমি যখন চেষ্টা করতাম হাল্কা হতে তখন আমি নিজের কাছেই ক্রমাগত হাস্যকর হয়ে উঠতাম এবং নিজের অসহায় অবস্থা কল্পনা করে ভেতরে ভেতরে আরও সিটিয়ে যেতাম। আমার দুতিনজন বন্ধু ছিল, তাদের নিঃসংশয়ে উঁচু জাতের আর্টিস্টের পর্যায়ে ফেলা যায়। তারা যেন কথার চার ফেলেছে। কোন বার চারে এসে মাছ ঠোকরাল, ফাৎনা নড়ে উঠল। কিন্তু সেয়ানা মাছই বেশী। সন্তর্পণে চার ঠুকরে ল্যাজ নাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। আমি দেখতাম তাদের বিরক্তি অবসাদ বলে কিছু নেই। তাদের সেই অপরিসীম ধৈর্য দেখে আমি অবাক হতাম, শ্রদ্ধাও হত। কোন হতাশাই তাদের হতাশ করত না, কোন ক্লান্তিই তাদের ক্লান্ত করতে অক্ষম। যখন মাছ পালাত তখনও যেমন তারা প্রচণ্ড দুঃখে অভিভূত নয়, তেমনি যখন মাছ তাদের টোপ গিলত আর তারা সেই নিরুপায় জন্তুটিকে অসামান্য পারদর্শীতায় খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তুলত তখনও কোন প্রকাণ্ড উল্লাস তাদের পেয়ে বসে নি। তারা আমায় বলতই, "খেলতে এসেছিস খেলবি। হাল্কা চাল হবে। তোর মেজাজ দেখলেই তো মেয়েরা পালাবে রে। কেউ ভিড়বে না।" বাস্তবিকই বিশেষ কেউ ভেড়ে নি। চাকরিটা আমি ভালই ম্যানেজ করেছি। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারটা আজও ম্যানেজ করতে

পারলাম না। আর পারাও যাবে না যা দেখছি। আমি এ ব্যাপারটায় একটু ভারীই, আর হাল্কা হয়ে কাজ নেই। আমার বন্ধুরা খলিফা আদমী, তাদের সেলাম। তবে তাদের মতো আমি হতে পারব না। আমার কাছে ঐ পুরুষ ও নারীর ভেতরে সর্বক্ষণ বিজাতীয় প্রতিযোগিতা মোটেই প্রীতিকর নয়। জানি না তারা নিজেদের সম্বন্ধে কি ভাবেন, তবে অন্তত আমার কাছে নারী দেবীও নয়, নারী মাছও নয়। পুরুষ ও নারীর বাঁচার সমস্যা মূলত একই, দুজনেরই আনন্দের আধার এক, দুঃখের একই পাত্র থেকে তারা পান করছে। কিন্তু এ তত্ত্বে কোন সান্ত্বনা নেই। কারণ যখনই এ তত্ত্ব আমার আচরণে কিংবা কথায় প্রকাশ পেত দেখতাম নারীসমাজ সরে দাঁড়িয়েছে। তাই খুব একটা হাস্যকর চিন্তা মাঝে মাঝে আমার মনে উঁকি দিয়ে যেত। ভাবতাম যেমন কখনও কখনও কাগজে পড়া যায় তেমনি কোন বৈপ্লবিক দৈহিক পরিবর্তন যদি আসে আমার পুরুষ বন্ধুদের কারুর মধ্যে তাহলেই হয়ত আমার পক্ষে নারীসঙ্গ সম্ভব হবে।

সোনার বোন মিনুর ক্ষেত্রে কিন্তু কথাগুলো প্রযোজ্য নয়। তার সঙ্গে আলাপে সাজিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। প্রথম লজ্জাটা তার তরফ থেকে কেটে যাবার পরই চেঁচিয়ে ঝগড়া করা যায় এমন খরখরে সে। তবে ঝগড়ার উপাদান কিছু খুঁজে পেলাম না। আমি রমেনকে এ ব্যাপারে একটু হিংসে করতে শুরু করেছিলাম। রমেন অবলীলাক্রমে যাতা বলতে পারে। তার কোন বাছবিচার নেই, আড়ষ্টতা নেই। দেখলাম এই আড়ষ্টতাহীন ব্যবহারে আমি যত কুঁকড়ে যাই মিনু তত খোলে। বরঞ্চ আমি যখন তাকে কি পড়ছে সে কিংবা তার কোন গান শুনতে ভাল লাগে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি

তখন সে আড়ষ্ট হয়ে যায়। নেহাত ভদ্র উত্তর দিয়ে ক্ষান্ত হয়। আমি আমার চরিত্র শোধরাবার চেষ্টা করলাম। কথায় একটু হাল্‌কা চাল আনার প্রচেষ্টায় তৎপর হলাম। কিন্তু মিনু আরও সরে গেল।

এক ছুটির দিন দুপুরবেলা গিয়েছি। সোনার বাড়িতে থাকার কথা কিন্তু সে নেই। মা বেরিয়েছেন পাড়ায় তাস খেলতে। ফিরে আসছিলাম। মিনু ডেকে বললে, "বসুন না। ছোড়দা কাছেই গিয়েছে, এখনই ফিরবে।"

বাইরের সামান্য হাওয়াটুকু থেকে বঞ্চিত এই বাক্সের মতো চারদিক আটকানো ঘরটায় বসে আমি ঘামতে লাগলাম। কি করব বুঝতে না পেরে দাদামণির রেখে যাওয়া ধর্মপুস্তকগুলো ঘাঁটতে শুরু করলাম। দাদামণি এত সুন্দর বাংলা বলেন অথচ বাইবেলের বাংলা এমন কদাকার হয়েছে কেন, একদিন জিজ্ঞেস করব ভাবলাম।

মিনু এসে একখানা হাতপাখা দিয়ে বললে, "আপনার পাখাটা তো মা লাগাতে দেন নি। এটাতেই হাওয়া খান।"

হাওয়া খেতে খেতে বললাম, "তারপর মিনু, কেমন আছ?"

মিনু বললে, "কই আপনাকে যে বলেছিলাম, কিছু করেছেন?"

আমি বিরক্ত হলাম। মনে হল মিনু তার চাকরি ছাড়া অন্য আলাপ করতে রাজি নয়। বললাম, "চাকরি তো এত তাড়াতাড়ি হয় না।"

"আপনি কাউকে বলেছিলেন?"

"দ্যাখো, তার চেয়ে তুমি একটা কাজ কর। চাকরি তো হতে সময় লাগবে, ইতি মধ্যে চুপ করে বসে না থেকে · "

আমাকে হাসতে দেখে মিনু অবাক হয়ে বললে, "হাসছেন কেন?"

আমি বললাম, "তুমি বরং এসময় একটা জাঁকিয়ে প্রেম কর।"

কথাটা বলেই আমি চুপ করে যাই। মিনুর মুখখানা হঠাৎ খুব কঠিন দেখায়। সে যেন দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে চোখ নিচু করল। তারপর পেছন ফেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে।

"আমি ঠাট্টা করছিলাম মিনু", একটু ক্ষুন্ন হয়ে বললাম।

আমার দিকে এক নজর তাকিয়ে মিনু গম্ভীর ভাবে বললে, "ঠাট্টা করার লোক পাচ্ছেন না বুঝি?"

তারপর একটা অসোয়াস্তিকর অবস্থা। টপ করে সে বেরিয়ে যেতে পারে না, তাতে বোধহয় তার ভদ্রতায় লাগছিল, আবার নতুন কথা আমরা কেউই আর পাড়তে পারছিলাম না। এরকম বিশ্রী আবহাওয়ায় রমেনের আবির্ভাব।

ঘরে ঢুকেই আমার হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে সে বাতাস খেতে লাগল। তারপর মিনুর দিকে তাকিয়ে বললে, "আমায় কবে খাওয়াচ্ছিস?"

মিনুর মুখে এতক্ষণ যে আড়ষ্টতা একেবারে ঘনঘটা করে ছিল দেখলাম আস্তে আস্তে তা কেটে যাচ্ছে। আবার হাসি ফুটল তার মুখে। বললে, "কেন রমেনদা?"

"তোর একটা চাকরি জোগাড় হয়েছে। একটু বদ চাকরি, গালে রং মাখতে হবে।"

মিনু বললে, "গালে রং মাখতে রাজি, কাপড় ঘুরিয়ে পরতে রাজি, যেমন ভাবে বলবে তেমনি হাসতে রাজি। তুমি চাকরিটা জোগাড় করে দাও রমেনদা।"

"আমি অবশ্য বলেছি। ওদের ওপরওয়ালার সঙ্গে আমার খাতির আছে। আমি বলে দিয়েছি বদমায়েসি টদমায়েসি করতে পারবে

না। সেরকম কিছু হবে না। তবে একটু ছিমছাম ফিটফাট থাকবি।"

মিনু বললে, "কবে থেকে জয়েন করব?"

"সামনের মাস থেকে।"

চেয়ে দেখলাম আনন্দে মিনুর চোখমুখ ঝলমল করছে। আমার দিকে তাকিয়ে তার স্বাভাবিক অকৃপণ হাসি হেসে বললে, "কিরকম, দেখলেন তো! রমেনদা পারল আপনি পারলেন না।"

"রমেনদা মহাপুরুষ।"

রমেন তার বেয়াড়া হাসিটা আরম্ভ করল। তারপর হাসির শেষে বললে, "আমরা মহাপুরুষ নই, মহাপুরুষ স্যার আপনারা। আমরা যেখানে থাকি সেখানকার লোকের পা চাটি, যদি দেখি একটা মিথ্যে কথা বললে কারুর কোন উপকার হবে তার জন্যে মিথ্যে বলতে ঘাবড়াই না। আমরা তো আর আপনার মতো চাকরি করি না 'প্রিন্সিপলের' জন্যে। আমাদের সব 'পেটকা ওয়াস্তে।' আপনি কারুর চাকরির জন্যে কারুর কাছে কখনও উমেদারি করেছেন বলুন সত্যি করে?"

"না"

"তাহলেই দেখুন, আপনি পারেন শুধু মিনুর সঙ্গে উহুঁউহুঁ হুঁহু হুঁহু করতে।"

রমেনের আক্রমণে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। কি জবাব দেব ভেবে পাই না। অথচ একটা কিছু না বললে রমেনের কথাই মেনে নিতে হয়। আমাকে মিনুই বাঁচিয়ে দিল। কিছু বলবার আগে সে-ই বললে। "তোমার কোন মাথার ঠিক নেই, রমেনদা। আমার সঙ্গে ওঁর হুঁহু হুঁহু করতে বয়ে গেছে।"

রমেন বললে, "আমি কি অন্যায় বলেছি বল। যারা কলা করে সে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সব একটু সুযোগ পেলেই…"

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। রমেন তার ফরমুলাতে এসে গেছে। বললাম, "আমাকেও কি কলাবিদ ঠাওরালেন রমেনবাবু?"

"বাঃ ঠাওরাব না। আপনার রকমসকম দেখেই মনে হয় ভদ্দরলোক, যাকে বলে রুচিবান। আমরা ভদ্রলোকও নই। রুচিফুচির তোয়াক্কাও করি না (শেষের 'চ' গুলো সে 'স'-র মতো উচ্চারণ করল)।"

মিনু বললে, "বেশ বেশ। ভারী বীর তুমি। তোমায় তোয়াক্কা করতে হবে না।" খুশীতে তার গলা ভরে এসেছে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বসুন। ছোড়দা, মা এখনই এসে যাবে। আমি রমেনদার সঙ্গে একটু বেরুচ্ছি।"

আমি একলা ঘরে বসে পাখা খেতে থাকি। কতক্ষণ পর আমার হাত থেকে পাখাটা খসে পড়ে। আমি ঘামছি কি ঘামছি না খেয়াল থাকে না। সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে থাকে একটা প্রশ্ন ঃ এই চন্দ্রসূর্য-নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে মানুষের এই অন্তহীন সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এ পৃথিবীর ওপর রমেনের দর সবচেয়ে বেশী হবে কেন? আমি কিংবা সোনা যাই ভাবি না কেন তা শুধু ব্যক্তিগত আনন্দ কিংবা নিরানন্দেরই সামিল হবে আর রমেনের ভাবনার দাম সমাজ দেবে কেন? চাকরির উমেদারির প্রসঙ্গে রমেনের ঠোক্কর হয়ত সোনা উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু আমার মনে তা লেগেছে।

সেদিনের কথাবার্তায় আচরণে রমেন ও মিনুর মধ্যে একটা মস্ত মিল খুঁজে পেলাম। এমন কি মিনুর কথায় একটা গভীর বন্ধুত্বের ভবিষ্যত মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল। তাদের দুজনেরই এ সমাজ

পৃথিবী জীবন সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামানো সময়ের অপব্যয় মনে করে। হাতের কাছে যা সুযোগ আছে তাই তারা সাধ্যমতো লুটেপুটে নেয়। যা নেই তা নেই। তার জন্যে ক্ষোভ নেই তাদের। রমেনের কথাবার্তায় চালচলনে ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। সে পাঠ্য পুস্তকে পড়া নীতিবোধ কিংবা রুচিবোধে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু সমাজ তার চুলের ডগাটি ছোঁবে না। সে এক পরিবারের স্তম্ভ বিশেষ, অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে তার প্রবল খাতির, মেয়েদের মহলে সে রাজপুত্র। আর সোনা? সোনা কে? কেউ না। সে যখন তার ভারী গলায় মায়াকভস্কি আবৃত্তি করে তখন আমি রোমাঞ্চিত হই। সে যেদিন পার্কের কোণে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে "ক্লাউড ইন ট্রাউশার্স" আবৃত্তি করল সেদিন মনে হয়েছিল দাদামণি প্রার্থনা করছেন। কিন্তু এই সোনাকে আমি কল্পনা করতে পারি না কোন অফিসে। 'বস্' যাদের বলা হয় সে শ্রেণীতে তার অবস্থান অচিন্তনীয়, আবার সে যে মাথা নিচু করে হুকুম তামিল করছে তা ভাবাও প্রায় অসম্ভব।

রমেনকে আমি তারিফ করতে পারি এমনকি তার সাফল্য আত্মবিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু তাকে কিছুতেই আমার বন্ধু বলে মেনে নিতে পারব না। আমার বন্ধু সোনা, আর মিনুকেও বন্ধু হিসেবে কোন দিন পাওয়া যাবে না। আমি আর সোনা যখন আলাপ করি তখন সে আজকাল ঠাট্টা করে, আমাদের আলোচনা বড় বড় কথা বলে উড়িয়ে দেয়। আমাদেব হয়ত অনেক কথার সঙ্গে কাজের যোগ কম। সেজন্যে রমেনের ভাষায় যারা 'কলাটলা' না বলে একেবারে মোদ্দা কথার মানুষ বোধহয় এক হিসেবে তারা ভাল। মিনুর বোধহয় তাদেরই ভাল লাগে যারা জোর

গলায় জানিয়ে দেয় যে খাওয়া পরা চাকরি করা সংসার করা ছাড়া আর কোন অস্তিত্বের জন্যে তারা পীড়িত নয়। কিন্তু তাদের আমি দূর থেকে তারিফ করতেই ভালবাসি।

অন্যমনস্কভাবে দাদামণির ধর্মপুস্তকগুলো ঘাঁটছিলাম, হঠাৎ দাদামণির বাংলা লেখার দিকে চোখ পড়ল। দাদামণি "বুক অভ্ সাম্" বাংলায় অনুবাদ করছেন। রুলটানা খাতার পাতায় গোটা গোটা পরিষ্কার হরফে লেখাঃ ভগবান আমায় বাঁচাও। জল আসছে আমার আত্মার চারদিক ছেয়ে। আমি পাঁকে ডুবছি, আর যে দাঁড়াতে পারছি না। এখন গভীর জল চারদিকে, বানের জলে আমায় ভাসিয়ে নেবে। আমি কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত, গলাও শুকিয়েছে। আমার চোখের জ্যোতি ক্ষয়ে গেল আমার ভগবানের অপেক্ষায়।"

দাদামণির ভগবানকে আমি বিশ্বাস করি না তবু দাদামণিকেও বন্ধু হিসেবে হয়ত লাভ করতে পারি। কিন্তু রমেনকে পারি না, মিনুকেও পারব না। তবে মানুষের কাছে আসতে গেলে কি চির-কালই ভগবানের কথা বলতে হবে কিংবা কোমর বেঁধে দল গড়তে হবে, সংগঠন সাজাতে হবে? কেন, মানুষের ভালত্ব কি যথেষ্ট নয়? পাদরী পুরুত না হলে কিংবা রাজনৈতিক লীডার না বললে কি মানবতার কোন ভবিষ্যত নেই?

সোনার জন্যে অপেক্ষা না করেই সেদিন বাড়ি ফিরলাম।

পাঁচ

অফিসে বড় ঝামেলার কাজ ছিল সেদিন। সকাল দশটায় কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে বিকেল পাঁচটায় শেষ করে বাড়ি ফেরা আমার ভাগ্যে নেই। এখানে ওখানে দৌড়দৌড়ি, পরমুহূর্তেই অঙ্ক কষতে বসা, তারপর কোন গণমান্য লোক এলে তাঁকে নিয়ে সহরের বাইরে আমাদের কারখানা দেখানো অথবা কোর্টে আমাদের কোন কেস থাকলে তার তদ্বির করা, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ধর্মসাক্ষী করে মিথ্যে বলা এগুলোই আমাকে অন্ন দেয়। সন্ধ্যেবেলা ইচ্ছে করে বাড়ি ফিরে কোন বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকি। নেহাত খুব প্রয়োজনীয় কথাবার্তা যেমন ঠাকুরকে ডেকে চা করতে বলা অথবা বাবার কথায় হুঁ দিয়ে যাওয়া, এছাড়া কথা কইতে কোন কোন দিন কষ্ট হয়, জিভ টেনে ধরে। এক এক দিন নিজেকে প্রায় চাবকিয়ে স্মরণ করি যে বহু বিঘোষিত জীবনের যে অধ্যায়ে মানুষের রক্ত উত্তপ্ত হয় আর সে উষ্ণতা মনেও ফুল ফোটায় সেই যৌবনের আনন্দলোকে আমি পা ফেলে ফেলে চলেছি। তখন বোঁ করে অফিসের এক বন্ধুকে নিয়ে কোন সিনেমাহলে ঢুকে যাই। যখন ফিরি তখন হাত পা এত ভারী হয়ে গেছে যে ট্রামে বাসে লাফিয়ে উঠতেও কষ্ট হয়। বাড়ি পৌছই যখন তখন আমি প্রৌঢ়ত্বের দরজায়।

কিন্তু সোনার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে আমি নতুন করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলাম। গরম কেটে বর্ষা এল এইভাবে।

অফিসের কাজ শেষ হবার পরই আমার যখন মনে পড়ত সোনার বাড়ির সামনের পার্কটা এখন বর্ষার জলে কেমন সবুজ হয়ে রয়েছে, কেমন পার্কের এক কোণে সোনার ছোট বোনটি তার লাল রিবন মাথায় নারকেলের দড়িতে স্কিপ করছে আর তার ছোট ভাই বাঁশের এক কঞ্চি দিয়ে তাজা ঘাসের ডগার মধ্যে সমস্ত মন নিমগ্ন একটি গরুকে অবিরাম বিরক্ত করে চলেছে তখন আমার সমস্ত শরীরে এমন এক সহজ উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ত যা কোনক্রমেই সম্ভব না হলিউডের নায়িকার অনাবৃত গা দেখে। আমার অফিসের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতেন এ্যাদ্দিন পর আমি সত্যিই প্রেমে পড়েছি কিনা। কারণ অফিসের ছুটি হতে না হতেই এককাপ চা আর টোস্ট খেয়ে আমি দৌড়তাম সোনার বাড়ি। আমার কাল্পনিক প্রেয়সীর এক জমকালো চেহারার বর্ণনা দিতাম আমার অফিসের বন্ধুদের কাছে।

অফিস থেকে সেদিন বেরোব বেরোব করছি এমন সময় জাঁকিয়ে বৃষ্টি এল। চারদিক অন্ধকার করে মেঘ বিদ্যুৎ ধুলো নিয়ে জল এল। বৃষ্টির রকম সকম দেখে মনে হল সহজে থামবার নয়। রেস্তোরায় একপাশে দেখলাম শ্যামবাবু। আমি ভিড় ঠেলে শ্যামবাবুর কাছে এগিয়ে যেতেই তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। সে চোখে প্রথমে এক আতঙ্কের ভাব ছিল। তারপর এমন বিশ্রী অসহায়তায় আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন যে আমি তাঁর কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, "কি শ্যামবাবু, কি হয়েছে?"

বলেই আমার চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। ছাইদানির পাশেই রেসের টিপ। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আপনি আবার—"

শ্যামবাবু মুখ বিকৃত করে চেঁচিয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি? আমি কারুর খাই না পরি যে অন্যকে কৈফিয়ত দিতে হবে? আর তাছাড়া গ্যাম্বলিং একটা আর্ট। সবাইয়ের হয় না। আপনি শত চেষ্টা করলেও আপনার হবে না।"

আমি পাশের চেয়ারে বসে পড়লাম। যে লোকটা ঘোড়ার জন্যে তার সর্বস্ব গিয়েছে বলে কয়েকমাস আগে দুঃখ করেছিল তাকে আবার কেন ঘোড়া পেয়ে বসল জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু শ্যামবাবুর ভাবগতিক দেখে সাহস হল না কিছু বলতে।

সেদিন যখন শ্যামবাবু তাঁর অতীতের ইতিহাস বলতে শুরু করেছিলেন তখন তাঁর মুখচোখের ভাব ছিল আলাদা। অনেক কষ্ট আব অনুতাপের পর মানুষটা যেন বিচক্ষণতা অর্জন করেছে এমনি শোনাচ্ছিল তাঁর কথা। আর আজ সমস্ত বিচক্ষণতা ধিক্কার দেবার এক প্রকাণ্ড উত্তপ্ত দাপট তার মুখে চোখে ফেটে পড়েছে। মোটা আঙ্গুলগুলো আমার মুখের সামনে নাচিয়ে বললেন, "আপনি অস্বীকার করেন সমস্ত লাইফটাই এক গ্যাম্বলিং?"

হেসে হালকা ভাবে বললাম, "তা করি বই কি।"

শ্যামবাবু আমার কথা শুনতে পান নি মনে হল। চায়ের কাপ রেসের টিপ সরিয়ে খুব আস্তে আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে ঘা দিতে দিতে বললেন, "আপনি বিশ্বেস করেন না আমাদের চাকরি সংসার আমাদের চলাফেরা ওঠা বসা সমস্ত একটা বিরাট গ্যাম্বলিং? মায় ঐ যে লোকে দেশ দেশ করে চেঁচায় কিংবা মেয়েমানুষের পেছনে ছোটে, ও সবই এক ব্যাপার। এই ধরুন আমাদের অফিস শুনছি এক মারোয়াড়ী কিনে নেবে। তাহলে কি আমার আপনার চাকরি থাকবে ভেবেছেন? এক কলমের খোঁচায় একেবারে অর্ধেক মাইনে।

হয়ত বা হলেন না।" টিপের বইয়ের এক জায়গায় তাঁর মোটা আঙুল দাগিয়ে বললেন, "যে 'লাফিং প্রিন্স' আপনি ছাড়লেন সেটা এক ফারলং-এ আর সবাইকে মেরে জিতে গেল। আর আপনার 'বিউটি কুইন' জড়িয়ে ধরে ডুবলেন। এই তো লাইফ।" ভদ্রলোক হঠাৎ চুপ করে যান।

এত কথার পর আমার প্রশ্নের কোন মানে থাকে না যদিও সেদিনের আত্মধিক্কার আমার কানে তখনও বাজছিল। কিন্তু যে লোকটা সমস্ত জীবনটাকেই দেখছে রেসের এক ময়দান তাকে ঘোড়ার রোগ জিজ্ঞাসা করা কেন?

শ্যামবাবু হঠাৎ চোখ নামিয়ে বললেন, "নিশ্চয় ভাবছেন আবার কেন ঘোড়ার পেছনে গেলাম, না? ভেবে দেখলাম কি হবে না গিয়ে! আর কয়েকটা বছর পার হলে না হয় বাবার মতো কাশীতে গিয়ে বসতাম। এ কটা দিন না হয় ঘোড়ার পেছনেই দিলাম।"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনি যে জমিটা কিনেছিলেন···"

ভদ্রলোক আমার কথা লুফে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ি বানাব, ঘর সংসার করব। সব ভেজাল। বউয়ের নামেই করেছিলাম। আবার ঝেঁপে দিয়েছি।"

"ঝেঁপে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়ি-ফাড়ি আবার কিসের জন্যে!"

ভদ্রলোকের মুখে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি আসে। তাঁর বড় বড় চোখ চকচক করে ওঠে। টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, "এবার স্যার শেষ খেলা, এই খেলাই চলবে শেষ দিন পর্যন্ত। ওসব অনুতাপ টনুতাপ নেই। দুঃখ নেই, কিচ্ছু নেই। যাই, বিষ্টি ধরে গেছে।"

বৃষ্টি ধরেছে সত্যি। কিন্তু জায়গায় জায়গায় জল এখনও নামে নি।

আর এই জলে জলাকার এসপ্ল্যানেডে এক অদ্ভুত চাঁদিনী ফুটেছে। ট্রাম বন্ধ, জল ঠেলে বাস চলেছে। নিশ্চয় এতক্ষণ খুব তোড়ে বৃষ্টি নেমেছিল, কথায় কথায় ঠাওর হয় নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এমন এক আকাশ যা কেবল পৃথিবীর এ প্রান্তেই সম্ভব। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এমনি নীল একখানা রেশমের চাদর। বোধহয় পূর্ণিমার আগের দিন। দারুণ জেল্লা হয়েছে চাঁদের। সাদা সাদা মেঘগুলো মনুমেণ্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে আর আলোয় রাস্তা গাছ বাড়ি বাস ট্রামের ছাদ যেখানেই জল জমেছে তাই রূপোর মতো জ্বলছে। না, ঠিক রূপো না। কি আশ্চর্য, আমার বাণভট্ট মনে পড়ল। আমি অবশ্য পড়ি নি। বাবার সংস্কৃত পড়ার বাই ছিল এককালে। তিনি যখন পড়তেন 'কর্পূরশুভ্রজ্যোৎস্না' আমার তখন কানে লাগত কথাটা, প্রায় হাসি পেত। জ্যোৎস্না আবার কর্পূরের মতো হবে কেন? কিন্তু সেদিন বোধহয় মন অন্যরকম ছিল। শ্যামবাবুর সঙ্গে বড্ড বেশীক্ষণ জুয়ার ময়দানে বিচরণ করে-ছিলাম আর আদর্শ টাদর্শ না থাকলেও একেবারে সব কিছু রেসের চাল বলে উড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। হঠাৎ বাইরে এসে এক বিরাট সৌরজগতের মাঝখানে নিজেকে আবিস্কার করে খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বাণভট্টের লাইন তারিফ করলাম। চাঁদিনী অত পোশাকী হবে কেন, রূপোর মতো অত সাজানো গোছানো হবে কেন? কর্পূরই বটে, যা হাতে নেওয়া যায়, গ্রহণ করা যায় দৈনন্দিন জীবনে। কর্পূরের মতোই ঘরোয়া সাদামাটা অথচ কি শুভ্র নির্মল এই জ্যোৎস্না। ভাল জিনিষ কি পোশাকী হয়?

একবার শুধু ভেবেছিলাম। এই জল ঠেলে এ রাত্তিরে সোনার বাড়ি যাওয়া কি ঠিক হবে। তারপর আর ভাবি নি। যখন সোনাদের

গলিতে নামলাম তখন সেখানে প্রায় এক কোমর জল। গলি পেরোতেই দেখলাম পার্কটা, উঁচু জমি বলেই ভেসে আছে। আমি জুতো হাতে জল ঠেলতে ঠেলতে পার্কে ঢুকলাম। খুব ফুর্তি লাগছিল। এ্যাদ্দিন বাদে আমার যাবার একটা জায়গা হয়েছে। ভাবতে ভাবতে পিছল জমিতে টিপে টিপে পা ফেলে এগোচ্ছি এমন সময় মিনুর গলার আওয়াজ পেলাম, "দেখছ দাদা, তোমার বন্ধু কি পাগল, এই জল ঠেলে আসছে।" আমি সে দিকে তাকাতেই আবার মেয়েলী গলা ভেসে এল, "ওসব ঢং। আর কিছুদিন যাক, ঠিক হয়ে যাবে।"

সোনার মায়ের গলাই মনে হল। একটু মনঃক্ষুণ্ণ যে হলাম না তা নয়। কাছে আসতে দেখি সোনা রকে দাঁড়িয়ে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "চলে আয়, চলে আয়। তোকে একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস্ দেওয়া হবে।"

আমি রকে উঠে পা মুছে বসলাম। সোনা দরজা ভিজিয়ে দিয়ে আমার পাশে বসে পড়েই বললে, "আর কি! এবার তো মেরে দিয়েছি।"

"কেন, কি হল ?"

"প্রায় ভাল হয়ে গেছি, আর কয়েকটা দিন! ক'দিন আগে যে এক্স-রে প্লেট্-টা নিয়েছি তা দেখে ডাক্তার বলেছে আর কোন ভয় নেই। ঘা সামান্য বাকী আছে শুকোতে। ...জানিস, কদ্দিন পর আবার সাঁতার কাটলাম। উঃ কি ভাল লাগল। আবার নতুন করে জন্মালাম মনে হচ্ছে।"

"ডাক্তার ঠিক বলেছে কোন ভয় নেই ?"

সোনা অসহিষ্ণু হয়ে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি তো। না বললে আর তোকে বলব কেন!"

চুপ করে রইলাম। সোনার আরোগ্যসংবাদে আমার আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠে আমাদেরই মতো বিচরণ করবে সুস্থ শরীরে এ খবরের জন্যে ঠিক তৈরি ছিলাম না। সোনা হঠাৎ বললে "আমি চাকরির চেষ্টা করছি।"

চমকে বললাম, "চাকরি?"

সোনা আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে আহত হল। বললে, "এত লোকে চাকরি করছে তাতে তুই অবাক হচ্ছিস না আর আমি চাকরি করব শুনেই একেবারে আকাশ থেকে পড়লি।"

আমি লজ্জা পেয়ে বলি, "না না, আকাশ থেকে পড়ছি না। তবে এত সাত তাড়াতাড়ি......"

"হ্যাঁ তাড়াতাড়িই, আর পারছি না। এই অসুখের জের টেনে টেনে কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিলাম। আর বাঁচতে পারি না এ ভাবে।"

"তুই ফের পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল সোনা। আমি না হয় ততদিন পর্যন্ত..."

"তুই আবার বাগড়া দিসনে। আমার কি ভাল মন্দ সেটা আমি নিজেই বুঝতে শিখেছি।"

তার কথার জবাব দিতে গেলে ঝগড়া বেধে যাবে। অথচ আমি তার কথা মেনে নিতে পারলাম না। স্পষ্ট অনুভব করলাম আমাদের দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য পাঁচিল উঠছে। সোনার সুস্থতার মারফত সেই পাঁচিলের ভিত পাকা হয়েছে। এর পর যত দিন যাবে তত এই পাঁচিল মাথা খাড়া করবে। শেষে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান হয়ে দাঁড়াবে আমাদের দুজনের মধ্যে। সোনা চাকরি করবে। আর চাকরির জগত তো আমার অজানা নয়। যে ছেলে মায়াকভস্কি আর

পল এলুয়ার পড়ে সন্ধ্যের পর সন্ধ্যে কাটিয়েছে, চলতে ফিরতে সামান্য অসৌজন্য যাকে কাঁটার মতো বেঁধে, যে তাকিয়ে থাকে ভাল কথা শোনবার জন্যে, নিজেকে তৈরি করে অনুভূতিময় এক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে, আর সব চেয়ে বড় কথা যে মৃত্যুর সামনে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে সমস্ত জীবনকে এক নতুন আলোয় ফেলে দেখেছে, এক দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছে, সে এক সরকারী কি সওদাগরি অফিসের টেবিলে গুচ্ছের খানেক মানুষের মাঝখানে বসে কলম পিষছে ভাবতে আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সেই যান্ত্রিক ভবিষ্যতহীন ভবিষ্যতকে বাধা দেব স্থির করলাম। অন্তত তাকে আরও কিছুদিন নিজেকে তৈরি করে নিয়ে তবে যেতে হবে বাইরে। নইলে বাইরের চোট সহ্য করতে না পেরে সেও লেপে পুঁছে একাকার হয়ে যাবে। এর প্রতিরোধ করবই।

এতক্ষণ খেয়াল করি নি। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি পার্কের মাঝখান দিয়ে একটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে একটু ভড়কে যাই। একটা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। জলে ভেজা মস্ত পেণ্টুলুন পরনে, গায়ে একটা কালো ওভারকোট, গলায় বোধহয় সিল্কের চাদর মাফলারের মতো জড়ানো। রাস্তার আলোয় দেখলাম তার হাতে কতগুলি পেঁয়াজের কলি, মূলোর শাক আর একটা মস্ত কাঠগোলাপ। আমি সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। মুখখানা আলোর উল্টো দিকে থাকায় লোকটাকে চিনতে পারি নি। সোনার কথায় চমক ভাঙলো। সোনা ডাক দিল, "কি পানুদা, এই বাদলায় কোথায় বেরিয়েছ ?"

পানুদাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। সেই উলঙ্গ মূর্তিটার গায়ে এতগুলো কাপড় চাপানো থাকায় একই লোক বলে চিনে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল।

পানুদা এদিক ওদিক তাকিয়ে সোনার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললে, "মাইকেল এসেছিল মাইরি, মাইকেল।"

সোনাও ঠিক পানুদার মতো ফিসফিস করে বললে, "কি কথা হল, তোমার লেখা দেখিয়েছিলে ?"

পানুদা আবার এদিক ওদিক তাকাল। লক্ষ্য করলাম তার দাড়ির ভেতর থেকে একটা হাসি ফুটে উঠছে। বললে, "আমার বিদ্যেসুন্দর-টা খুব তারিফ করল সোনা। এত তারিফ করল আমারই লজ্জা হচ্ছিল।" সত্যিই লাজুক ভাব করল পানুদা।

সোনা উৎসাহ দেখিয়ে বললে, "তাহলে এক কাজ কর পানুদা, তুমি মাইকেলকে দিয়ে তোমার বইয়ের একটা ভূমিকা লিখিয়ে নাও। ছাপতে সুবিধে হবে। খুব কাটবে বাজারে।"

হঠাৎ সোনার হাত চেপে ধরে পানুদা বললে, "শোন, তোকে একটা কথা বলি। কাউকে বলবি না বল। যদি বলিস মেরে ফেলব, একেবারে পিটিয়ে মারব বলছি।"

সোনা হেসে বললে, "দূর পানুদা, তা কি কখনও বলতে পারি। তুমি বিশ্বাস করে বলছ আর আমি বলে দেব !"

পানুদা বললে নিচু গলায়, "ঐ যে পেঁয়াজওয়ালীটা বাজারে ঢুকতেই বসে, ও আমায় কি বলেছে জানিস ? আমায় বিয়ে করবে বলেছে। আমি বলেছি, দূর তাও কখনও হয়, আমি ভদ্দরলোক নই !"

সোনা সশব্দে হেসে উঠল। আমিও হেসে ফেলি। বাজারের পাশ দিয়ে আসতে পানুদার পেঁয়াজওয়ালীকে আমিও দেখেছি একদিন। ডাগরডোগর চেহারা, মুখে চোখে কথা বলছে মেয়েটা।

আমাদের হাসতে দেখে পানুদা ক্ষেপে গিয়ে বললে, "আমি কিছু অন্যায় বলেছি, আমি ভদ্দরলোক নই ?"

সোনা হাসি সামলাতে সামলাতে বললে, "নিশ্চয় নিশ্চয় পান্নুদা, তুমি ভদ্দরলোক না হলে আর কে ভদ্দরলোক হবে শুনি।"

পান্নুদা এবার হাসে। খুশি হয়েছে লোকটা বোঝা যায়। বলে, "তুই আমাকে কবে কই মাছ খাওয়াবি সোনা।" তারপর জলে জলাকার রাস্তার দিকে চেয়ে বললে, "শীতকাল এল। এখন বেশ চমৎকার করে কই-শর্ষে রেঁধে··" পান্নুদার কথা শেষ হয় না, তার মুখ দিয়ে একটা তৃপ্তির আওয়াজ বের হয়। মাংস চিবনোর সময় যেরকম আওয়াজ হয় সেই রকম আওয়াজ করতে করতে হঠাৎ উল্টোদিক ফিরে হাঁটতে থাকে পান্নুদা, সোনা পেছন থেকে ডেকে বলে, "পান্নুদা, পান্নুদা, তুমি কবে খাবে?" পান্নুদা কোন উত্তর দিল না। সেই এক ধরণের শব্দ করতে করতে গলি পার হয়ে গেল।

পান্নুদার হঠাৎ আবির্ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তায় রাস্তার জল প্রায় নেমে গিয়েছে। মেঘ এসে চাঁদ ঢেকে দিয়েছে। হাওয়া উঠছে। একটা লোক কাঁধে বাক্স ঝুলিয়ে 'ঘুগনি ঘুগনি' বলে হাঁক দিয়ে পার্ক প্রদক্ষিণ করল।

"পান্নুদা কেন পাগল হল জিজ্ঞেস করলি না?" সোনা হঠাৎ প্রশ্ন করে।

"কেন রে, কবিতার প্রেমে পড়েছিল?"

"না না। চরম গল্পের ব্যাপার। দাঙ্গায় পাড়ার ছেলেরা একটা মুসলমানকে পিটিয়ে মারে। পান্নুদাও সে দলে ছিল। তারপর থেকে তার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়।"

"পান্নুদা ওর মধ্যে ছিল?"

সোনা ম্লান হেসে বললে, "পান্নুদা কেন আমরা সবাই ছিলাম। একটু পেছনে থেকে হাততালি দিচ্ছিলাম এই তফাত। পান্নুদার

অবশ্য উপায় ছিল না। বাপ মারা যাবার পরই ওদের পরিবারটা ভেসে যায়। পানুদা পাড়ায় যাত্রা করত, বাড়ি বসে দিস্তে দিস্তে পদ্য লিখত আর মনের আনন্দে তবলা পিটত। তারপর বাবা মারা যাবার পর বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি বাজার সরকার হয়েছিল। দাঙ্গা বাধলে দারোয়ানদের সঙ্গে ওকেও বেরোতে হয়েছিল রাস্তায়। নইলে দু বেলা খাওয়া জুটত না।" খানিক্ষণ থেমে বললে, "সে এক দৃশ্য বটে। ইয়া ইয়া পেল্লাই পেল্লাই দারোয়ান গোয়ালারা ছুটেছে লাঠি উঁচিয়ে, তাদের সঙ্গে রোগা টিংটিংয়ে পানুদা কোথা থেকে একটা ভারী বাঁশ নিয়ে ছুটেছে আর মাঝে মাঝে ভার সামলাতে না পেরে ঠোক্কর খেয়ে পড়ছে। পাড়ার ছেলেরা তাই দেখে বেদম হাততালি দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে—চীয়ার আপ পানুদা, চীয়ার আপ পানুদা।"

"তুই কোথায় ছিলি ?"

"আমি! সে আর বলিস নে।" হঠাৎ সে চুপ করে যায়।

আমি অবাক হয়ে বলি, "কেন, কি হল ?"

"তখন আমি ঠিক আমিই ছিলাম না। ঠিক তখন কেন, সারাটা কলেজ জীবন থেকে আমার অসুখ পর্যন্ত এত বড় সময়টা প্রায় উড়িয়ে দিয়েছি ফুঁ দিয়ে। রকেই কাটল যৌবন। রাস্তায় হাঁটলে মেয়েদের টিট-কিরি দেওয়া, ফুটবল গ্রাউণ্ডে মারপিট করা, দাঙ্গায় মুসলমান ঠেঙানো —এ সমস্তই আমার কাছে খুব স্বাভাবিক ছিল। এর ব্যতিক্রম হওয়াটা আর সকলের মতো আমারও মনে হয়েছে বোকামি, ভালমানুষি। প্রত্যেকদিন মানুষকে অসৌজন্য দেখিয়ে দেখিয়ে এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে এ নিয়ে সামান্য উত্তেজনাও হত না। অপমান করে বেঁচে থাকার রাজত্বে হঠাৎ একদিন আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হল। সেদিন পাড়াটাকে নতুনভাবে দেখলাম, মানুষগুলোকে চিনলাম আর

এক আলোয়। যেগুলো মনে হত একেবারে অদরকারী ফালতু ব্যাপার তাই ভয়ানক দরকারী মনে হতে লাগল। তারপর যতই অসুখ বেড়েছে ততই আরও নিবিড় ক'রে আমার চারপাশের জগতের সঙ্গে নিজের টান বোধ করেছি।"

এই সোনাকেই আমার ভাল লাগে। এই সোনা আমার সোনা। এই যে লোক নতুন করে জন্ম নিল পৃথিবীতে, নতুন করে দৃষ্টি মেলে ধরল মানুষের মুখের ওপর, এই লোকটাই আমায় টানে। আর আমার সমস্ত মন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে পাছে সে লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়, পাছে তার এই নতুন জন্মকে অস্বীকার করে আবার সে আমাদের চিরপরিচিত অসৌজন্যের রাজত্বে ফিরে যায়।

তার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলি, "তাহলে সোনা, তুই কি একটা দায়িত্ব বোধ করিস না তোর এই নতুন জন্মকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে ?"

সে আমার কথা চাপা দেবার চেষ্টা করল কিনা বুঝলাম না। চেঁচিয়ে উঠে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো চাকরির চেষ্টা করছি। রমেনের কাছে গিয়েছিলাম। রমেন বেশ বন্ধুভাবই দেখাল। লোকটাকে বোধ হয় আমি ঠিক নজরে দেখতাম না। আমায় নিজেই যেচে নিয়ে গেল ঐ যে রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশনের অফিস, ঐখানে। বড়বাবু বললেন···"

আমি এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলাম। এবার দৃঢ়ভাবে বললাম, "তোর চাকরি করতে হবে না সোনা। তোকে আমি মাসে মাসে একশোটা টাকা দিচ্ছি। ওর চেয়ে বেশী তোকে এখন কেউ মাইনে দেবে না, তুই পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল।"

সেই চাঁদের আলোতেও লক্ষ্য করলাম সোনার মুখের আশ্চর্য

পরিবর্তন। একটা চাপা রাগে হঠাৎ তার মুখখানা থম থম করতে থাকে। যখন কথা বললে কিছুক্ষণ পর তখন সে তার স্বাভাবিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে, তার গলা কাঁপছে। বললে, "তুই আমার অসুখের মধ্যে টাকা দিয়েছিলি। সে টাকা আমি চাকরি করে শোধ দিয়ে দেব।"

এমন অস্বাভাবিক মুখ বিকৃত হল তার যে এক ধাক্কায় তাকে রক থেকে নিচে রাস্তায় কাদায় ফেলে দিতে হঠাৎ তীব্র ইচ্ছে হল আমার। পৃথিবীতে অনেক রকম কষ্ট আছে কিন্তু তাদের মধ্যে একটি প্রধান কষ্ট হল, যার সম্বন্ধে নিজের সমস্ত অনুভূতি চিন্তা দিয়ে অনেক দিন ধরে একটা ধারণা গড়ে তোলা যায়, সেই লোকটা যদি হঠাৎ সে ধারণার সঙ্গে না মেলে। আর এই ধারণা বাইশ বছরে না হয়ে আটাশ বছরে হলে নিজের ওপর অশ্রদ্ধা নিজেকে গ্রাস করে। তখন অন্য লোকটার কি হল না হল সে কথা মনে না হয়ে নিজেই কিরকম ছোট হয়ে পড়লাম এ চিন্তায় নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হয়। এই বিভ্রান্তির মুহূর্তে মানুষের ওপর বিশ্বাসও টলতে থাকে। সোনা আমার কথার প্রতিবাদ করতে পারত। তার কারণ থাকতে পারে যা আমার কাছে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান না হলেও তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। হয়ত আমিও খানিকটা উত্তেজনায় কথা বলছি। বোধহয় সে তার এই নতুন জন্মের উপলব্ধিতে এমন কোন জোর আবিষ্কার করেছে যা তাকে এই অসৌজন্যের রাজত্বেও টিকিয়ে রাখবে, এমনি অনেক কথা আছে যা সোনা বলতে পারত। কিংবা কোন যুক্তি না দেখিয়ে তার স্বাভাবিক স্থৈর্যে আমায় জানাতে পারত যে এ প্রসঙ্গ নিয়ে এখন আলোচনা করতে সে রাজী নয়। আমি মেনে নিতাম। কিন্তু লোকটা এক মুহূর্তে পোকায় পর্যবসিত হল কেন?

আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি হাসবার চেষ্টা করলাম। ভাগ্যিস তখন চাঁদের জোস্না মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। নইলে সে হাসির চেহারা সম্বন্ধে আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বললাম, "আজ আমরা অনেক বকেছি। আর নতুন করে ঝগড়া শুরু করব না। রাত হয়েছে, চললাম।"

বলেই আমি রক থেকে নেমে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকি। জল নেমে যাওয়ায় কাদা আর আবর্জনা ছড়িয়ে আছে। আমার পা আর চলতে চায় না। সোনাদের বাড়ি থেকে গলির মোড় পর্যন্ত সামান্য রাস্তা, কিন্তু সেদিন যেন ফুরোচ্ছেই না। প্রায় মোড়ের কাছে এসে গেছি হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে চমকে ফিরলাম। সোনা একটা হাত বাড়িয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে আসছে। এসেই আমার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে শান্ত গলায় বললে, "রাগ করিস না, সামনের রোববার সকালে আসবি, কেমন?"

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আশ্চর্য সহজভাবে ঘাড় নাড়িয়ে সোনা হাসল। প্রথমে ভাবলাম বেশ একটা 'ম্যানেজ' করল সোনা। তারিফও করলাম মনে মনে। ফিরে যাচ্ছিল সে। ঘুরে আমার দিকে চেয়ে বললে, "আসিস কিন্তু, ভুলিস না।"

তার সেই স্বাভাবিক গলার আওয়াজ এক ঝলক হাওয়ার মতো আমার মনে এসে লাগল।

ছয়

পরের শনিবার সকালে একখানা চিঠি পেলাম। সোনার মায়ের চিঠি, আবার টাকার প্রয়োজন।

“এ চিঠি লিখবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছি লিখব না, কিন্তু আর উপায় নেই। রোগের সঙ্গে গত তিন বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করে আমি সর্বস্বান্ত। সকলেব কাছে বারবার হাত পেতেছি। কোন লজ্জা করি নি। সোনাকে জানাই নি পর্যন্ত। যে তাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি তার সামান্য আঁচও তার গায়ে না লাগে তার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি জানি না। সোনার চিকিৎসার জন্যে অবিলম্বে আরও অর্থের প্রয়োজন। খুব কম হলেও একশো টাকা, দুশো হলেই ভাল হয়। আমি তোমার কাছে হয়ত বড্ড বেশী দাবী করছি। তবু করলাম, তুমি এ টাকা অবিলম্বে জোগাড় করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। এ টাকা জোগাড় না হলে সোনার নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটবে। ডাক্তার বলেছে সে এখন আরোগ্যের পথে। কিন্তু তার মনের গড়ন একটু অন্যরকম হওয়ার দরুন সতর্ক থাকা দরকার যাতে তার মনে চোট না লাগে। আশা করি এ চিঠির খবর সোনার কানে পৌঁছবে না, টাকা জোগাড় না হলেও তুমি সোনার সঙ্গে দেখা কর। আজকাল খালি সে তোমার কথাই বলে। আমার আশীর্বাদ রইল।”

টাকার কথায় মনে পড়ল এবার পূজোয় আমাদের অফিস বোনাস দিচ্ছে। ইউনিয়নের সঙ্গে কোম্পানির কি একটা মিটমাট

হয়েছে তাতে অফিসার পিওন সকলেই একমাসের অর্ধেক মাইনে পাবে বোনাস হিসেবে। শ্যামবাবু বলছিলেন এ টাকাটা পূজোর আগেই এ্যাডভান্স হিসেবে দেওয়া যায় কিনা এ নিয়ে কথা চলছে। টাকা জোগাড় করতে খুব বেগ পেতে হবে না।

পরদিন রোববার সোনার বাড়ি যাই নি। কেন যাই নি পরেও তা ভেবেছি, টাকার ব্যাপারে হঠাৎ সাবধানী হয়ে পড়লাম এমন নয়। বিয়েথা করে ছেলেপেলে হলে হয়ত আর সম্ভব হবে না তবে অর্থ সাহায্য করা আমি এখনও অসামান্য কিছু বলে মনে করি না। প্রয়োজনে আমিও কোন কোন বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি।

আমি যাই নি তার কারণ সে রাত্তিরে সোনার শেষ কথাগুলো আমার কান তৃপ্ত করলেও মন ভরায় নি। যে অদৃশ্য পাঁচিলের ভিত গাঁথা হয়েছিল আমাদের দুজনের মধ্যে তা ভেঙ্গে পড়ে নি, এমন কি একটুও চিড় ধরে নি তাতে। মনে হচ্ছিল যত দিন যাবে তত ইট এসে বড় করবে এই পাঁচিল, তারপর একদিন আমাদের গলার আওয়াজ পরস্পরের কাছে পৌছবে না।

ঠিক মনে হল আমার এক ভীষণ দামী জিনিষ হারাতে বসেছি। সোনার পুনর্জন্মের আলো যা প্রথম প্রেমে পড়ার মতো আমার সমস্ত মন আলো করে তুলেছে তাকে এই মাটিতে ধরে রাখা যাবে না, তা ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবে, ছত্রাকার হবে সোনার ব্যক্তিত্ব। কিছুদিন যেতে না যেতে সেও সাবধানী মাঝামাঝি হিসেবী হয়ে পড়বে। যে তীব্রতার ঝাঁজে সে জ্বলছে সে অতীতের দিকে তাকিয়ে নিজেই লজ্জা পাবে। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে ভুলতে চেষ্টা করবে এই অতীত যা তাকে জ্বালিয়েছিল, যা অজস্র ইতস্তত বিরক্তি ছাপিয়ে তার কাছে

তার জন্মের নতুন মানে বয়ে নিয়ে এসেছিল। অথচ অতীত সে ভুলতে পারবে না। অতীত জেগে থাকবে। জেগে থাকবে একটা ফুলের মতো সৌরভ নিয়ে নয়, আগাছার মতো সর্বাঙ্গে জড়িয়ে। সে অতীত তার বিরক্তি বাড়াবে, আনন্দ দেবে না।

আমার ভয় আরও জোরালো হল কয়েকদিন পর সোনার চিঠি পেয়ে।

"তোর জন্যে একটা ভাল খবর আছে। চাকরি পেয়েছি। পুরো দুটো দিন চাকরি করেছি। কবে তোকে খাওয়াব বল।

সত্যিই আমার মনে হচ্ছে পুনর্জন্ম হল। জানিস তো রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অফিসের ভিড়। কত লোক কত ফিকিরে ঘুরছে। কত ঠক ভণ্ড জোচ্চোর অসহায় দুঃস্থ অনাথ মানুষ আমার টেবিলের আশেপাশে দরজায় গোড়ায় বারান্দায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের কত রকম আশা নিরাশা। আমি মাঝে মাঝে কাগজের ফাইল থেকে মুখ তুলে তাদের দেখি আর ভাবি, এরা কি সবাই জানে যে একটা অবিচল সম্ভাবনার সামনে সর্বদা দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের শরীরের রক্ত চলাচল থেমে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। কখন থামবে তা আমার অফিসের বড়বাবু, পিওন, ওপরওয়ালা, এমন কি মন্ত্রীমশাই—কেউ জানে না। তাদের এই অজ্ঞান আমাকে ক্ষমা শেখায়, আমাকে বিচারকের আসন থেকে নামিয়ে তাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়। তোকে দেয় না?

চাকরিটা পেলাম কিভাবে তাও বলি। তুই ঠিকই আন্দাজ করেছিস—রমেনের মারফত। আমাকে খুব বেগ পেতে হয় নি। রমেনই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যেটুকু বাধা ছিল কোথায় ওপরে চাপ দিয়ে সরিয়েছে। আমি তাকে নতুন চোখে দেখছি। সে আমায়

চাকরি দিয়েছে সেজন্যে নয়। বেশীর ভাগ মানুষই রমেনের মতো। তারা মোটা সুখ চায়। আর মোটা সুখ চাওয়াই মনুষ্যত্ব। এসব সুখের ওপর যে সুখ আছে তা নিয়ে মাথা ঘামান মানুষের মাস্টার মশাইরা কারণ তাঁরা মাথা ঘামিয়েই আনন্দ পান। রমেনদের কিন্তু নড়াতে পারেন না। রাজ্য রাজত্ব উঠবে পড়বে, দেশে আরও লোক-শিক্ষা বাড়বে, খাওয়া-পরার সমস্যার জটিলতাও হয়ত কমবে, কিন্তু রমেনরা আবহমানকাল যেমন ছিল তেমনি থাকবে। তুই যদি তাদের ভালবাসতে না পারিস তাহলে তুই আলাদা বিচ্ছিন্ন মানুষদের দলে গিয়ে পড়বি। তাতে তোর ক্ষতি বই লাভ হবে না। আর যদি রমেনের স্বার্থপরতা, তার মেঠোমি এবং তোর কথামতো 'ভাঁড়ামি'—এর সঙ্গে সঙ্গে তার সাহস, তার অপগণ্ড ভাইবোনগুলোকে দাঁড় করানোর চেষ্টা, প্রত্যেক সুযোগের ঝুঁটি ধরে তার এগিয়ে যাবার উদ্যম, এই সব নিয়ে একটা লোককে আরও প্রত্যক্ষ মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিস তাহলেই তোর আমার সকলের মঙ্গল। মানুষ কখনই অভ্রান্ত নয়। যে লোক লক্ষ লক্ষ লোকের হাততালি পাচ্ছে, দেশ-বিদেশ থেকে সম্মান কুড়োচ্ছে, সেও একটা প্রকাণ্ড জায়গায় রমেনের মতো। মোটা আনন্দ না পেলে তার মনও খালি থাকে। আমি তোকে কোন উপদেশ দেবার ছলে এসব কথা বলছি না। কষ্ট কি তা অনেকের চেয়ে আমার বেশী জানা আছে, তা নিয়ে গর্ব করছি না। কিন্তু এ কষ্ট থেকে আমি যা পেয়েছি তাই বলবার চেষ্টা করছি। আমায় অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। আমাদের আনন্দবোধকে আঙুরের মতো তুলোয় মুড়ে সযত্নে রেখে দিতে পারি কিন্তু তাতে এই ধূলাকাদাভরা প্রত্যেকদিনের বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত আবার সুখের উচ্ছ্বাসে আকুল গদগদ মানুষগুলোর কি এসে যায়। তারা চায় এমন একটা

আনন্দ যা নির্ভুল ঝকঝকে তকতকে নয়, গায়ে দিতে ভাবনা হয় এমন কাশ্মীরি শাল নয়, যাকে রিফু করলে কিছু আসে যায় না, কোঁচকালে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না এমনি একখানা কাপড় তারা চায় আরাম করে গায়ে জড়াতে। আমরা যদি একটুখানি আরাম দিতে পারি অন্যকে আমাদের চেষ্টায় আমাদের সৌজন্যে তাহলেই ভাবতে পারি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। যা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি না সে আনন্দের বোঝা বয়ে কি লাভ?

শরীরটা আমার খুব ভাল যাচ্ছে। মা যে কেন ওষুধ খাওয়া নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করেন বুঝি না। অফিসে একটু সকাল সকাল যাই ট্রামের ভিড় এড়ানোর জন্যে। দুপুরে টিফিনের দরুন একটা কৌটোয় করে খাবার নিয়ে যাই। বেশ লাগছে, তুই একদিন আয় না।"

প্রথমে ভেবেছিলাম উত্তর দেব না। কথা যদি কথা দিয়েই বোঝানো না যায় তাহলে চিঠিতে তা সম্ভব নয়। চিঠিতে কিছুটা সাজিয়ে বলা যায়, বিরোধের ওপর সহজ প্রলেপ বোলানো যায়। তবু বিরোধ মেটে না। একথা আমি জানি কিন্তু সোনার চিঠিতে কি ছিল যা আমার মনের শৃঙ্খলা এমন জোরালোভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে যে নীরব থাকা মুস্কিল হয়ে উঠল। দু দিন চেষ্টা করেছিলাম চুপ করে থাকতে। তিন দিনের মাথায় লিখলাম।

"মোটা আনন্দের কথা যা লিখেছিস তা আমার কাছে একটুও নতুন নয়। আমিও সেই আনন্দে আর সকলের মতো গড়াগড়ি দিতে চাই। কিন্তু ধূলোয় শুয়েও আকাশের তারাকে তারা বলব না কেন?

রমেনকে খাড়া করেছিস তুই মনুষ্যজাতির প্রতিভূ হিসেবে। আমি বলব রমেন কেন, আমাদের অফিসের শ্যামবাবু নয় কেন, কিংবা আমাদের চেনা অচেনা অসংখ্য মানুষ নয় কেন যারা কেবল

নিজের কোলেই ঝোল টেনে আনন্দ পায়, এ আনন্দের ঊর্ধ্বে যা কিছু তাকে ঠাট্টা করেই যাদের আনন্দ ?

কিন্তু আকাশের তারাগুলো সে ঠাট্টার ফুঁয়ে নিচে যায় না। তারা যেমন জ্বলছিল তেমনি দপদপ করেই জ্বলতে থাকে। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তুই যে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছিস তাকে আমি এই তারার আলোর সঙ্গেই তুলনা করি। আমার ধুলোর শয্যায় শুয়ে একটা মাস সেই আলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যদি সে আলো নিবে যায় আমি অন্য আলোর আশায় অন্ধকারে তাকিয়ে থাকব।

রমেনকে যদি আমি মনুষ্য জাতির প্রতিভূ হিসেবে ভাবি তাহলে আমার স্বার্থে আঘাত পড়ে। কারণ আমিও অনেক অংশে তার মতো। তার মতোই আমি সুবিধেবাদী, স্বার্থপর, দরকারে পড়লে তার ধাঁচে হেঁ হেঁ করতে না পারলেও অন্য কায়দায় পারি বৈকি। কিন্তু এক জায়গায় সে আর আমি তফাত। আমি চাই একটা অন্য কিছু দেখতে, আমি চাই অন্য ঘটনা ঘটুক। এই যন্ত্রের মতো দুর্নিবার খর্বাকৃতি অস্তিত্বের মিছিলে ছেদ পড়ুক। আর এক উদ্দীপনা আসুক আমাদের জীবনে। সে উদ্দীপনা আমাকে যতই বেকায়দায় ফেলুক না কেন আমার এই স্বার্থপর অস্তিত্ব নিয়েই আমি তাকে সেলাম করব।

তোর মা কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ঠিক এখন দিতে পারছি না। পরে চেষ্টা করব। কয়েকদিন আমি একটু ব্যস্ত থাকব, না দেখা হলে কিছু মনে করিস না।”

চিঠি লিখতে চাই না আমি এই জন্যে। লিখতে গেলেই এমন সাড়ম্বরে সাজিয়ে গুছিয়ে বলবার ইচ্ছে হয় যে আসল কথা হারিয়ে যায়। যেমন উপমা দেওয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটা মিথ্যের

আশ্রয়। যখনই সত্যকে ধরা যাচ্ছে না কিংবা খুব অস্পষ্টভাবে ধরা যাচ্ছে তখনই উপমার সন্ধান করে নিজের বক্তব্যকে দাঁড় করিয়ে অতি সুলভ সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা। আমার চিঠিতেও এমনি ভাবে নিজের যুক্তিকে দাঁড় করানোর একটা বেয়াড়া চেষ্টা ছিল। চিঠিটা পোস্ট করবার পর আমি টের পাই।

কিন্তু আসল কথাটা কি মুখেই বলা যায়? সোনার চোখের দিকে তাকিয়ে কি বলতে পারি, 'তুই সুস্থ হয়ে উঠে আর পাঁচজনের মতো লেপাপোঁছা হয়ে যাস নে। তার চেয়ে তোর মুখে যে মৃত্যুর আলো এসে পড়েছে তা বজায় থাক। রক্তের স্পন্দন স্তব্ধ হবার সেই অনিশ্চয়তা যেন তোকে ছেড়ে না যায়। তুই আবার সুস্থ হয়ে উঠে এই বেঁচে মরার জগতে নাম লেখাস না। তার চেয়ে ·····"

না, ঠিক অতখানি আমি চাই নি। মৃত্যুর পর মানুষ তো একটা স্মৃতিমাত্র তা যতই সুন্দর হক না কেন। আমি চাই না সোনা নিশ্চল ইট কাঠ পাথরের সামিল হয়ে পড়ুক। সেটা আমার কাছেও মর্মান্তিক বৈকি। কিন্তু তার চেয়েও মর্মান্তিক এই নতুন ভাবে নিজেকে ছত্রাকার করে দিয়ে একটা পুঁটকে জীবনকেন্দ্র বেছে নিয়ে নিজের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। এ আমি সহ্য করতে পারব না। সোনা শ্যামবাবু হয়ে যাবে, মাতব্বরী ঢংয়ে বলবে, 'আমাদেরও দিন ছিল ভাই, এখন বয়স হয়েছে'· ·এ অসহ্য। সে বাধা স্বীকার করে নিয়েছে, কোন একটা ছকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েছে, কয়েকটা টাকার ধান্দায় সকাল থেকে রাত্তির দশটা পর্যন্ত চরকি পাক খাচ্ছে, বিয়ের বাজারে সুপাত্রের গুণাবলী অর্জন করছে, বিতৃষ্ণা আর ঔদাসীন্যে মুখ বেঁকিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশছে, অহর্নিশি ইনক্রিমেণ্টের জন্যে তাকিয়ে আছে, অন্যকে ল্যাং মেরে ওপরে উঠবার চেষ্টা করছে, ফ্ল্যাশ

খেলছে, রেস্কোর্সের টিকিট কিনছে, জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাচ্ছে··· আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এ সম্ভাবনাকে রুখব। হয়ত আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন দাম নেই। কিন্তু আমার ইচ্ছে আমি প্রয়োগ করব।

সেই সোনাকেই আমি চাই যে আমার মনে নতুন আগ্রহ জাগিয়েছে। সোনা এক রাত্তিরে ওদের বাজারের মাঝখানে চার পাশে চাপা দেওয়া তরিতরকারির ঝুড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে মায়াকভস্কির 'ক্লাউড ইন ট্রাউশার্স' আবৃত্তি করেছিল। কলেজ জীবন পার হবার পর ওদিকে আমার কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ কেঁপেছিল সেই আবৃত্তি শুনে। যৌবনের গৌরব কাকে বলে তা আমি সেদিন সোনার দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে, তার গলার আওয়াজে, তার মুখের তীব্রতায় দেখেছিলাম। আরও একদিন দেখেছিলাম। তাকে ডাক্তার যখন ফিসফিস করেও কথা বলতে বারণ করেছিল সেইরকম এক সময় বাড়ির সবাইকে স্তম্ভিত করে সে রাত্তির দশটায় বাড়ি ফিরেছিল। তার মাথায় পাগড়ি, গলায় ঝুটো মুক্তোর মালা। মুখে বাজখাঁই গোঁফ লাগিয়ে সে পাড়ায় 'মহারাজ নন্দকুমার' অভিনয় করে ফিরল। আমি সেই চেহারা দেখেছিলাম। আর সেই বেপরোয়া উদ্দাম নির্লজ্জ যৌবনের নেতাকে সেলাম করেছিলাম মনে মনে। সেই লোকটাকে শ্যামবাবু কিংবা রমেনের পাশে কিছুতেই আমি কল্পনা করতে পারি না।

রমেনকে এমনভাবে কেন খাড়া করল সোনা? সে কি নিদারুণ আপস্ করছে না মিথ্যের সঙ্গে? সে তো কোনদিনই সহ্য করতে পারে নি রমেনকে। বরং আমিই তাকে বুঝিয়েছি কয়েকবার। বলেছি তার চরিত্রে কতকগুলো ভাল দিকের কথা। কিন্তু সে কর্ণপাত করে নি। সে একবার বলেওছিল যে রমেনের সঙ্গে তার

পার্থক্য একেবারে গোড়ার ব্যাপার, তার সঙ্গে মৈত্রী অসম্ভব। সেই রমেনের রূপ তার কাছে ভেলকির মতো পাল্টে গেল তার স্পষ্ট কারণ কি এটা নয় যে সে চাকরি পেয়েছে তার মারফত? একথা সে অস্বীকার করেছে কিন্তু অস্বীকার করার যুক্তি খুব প্রবল নয়। কিম্বা আজ বোধহয় অনির্দিষ্ট এক জগতে প্রবেশ করার আগে যা-ই হাতের কাছে আসছে তাই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছে, বিচার বিবেচনাগুলো মুলতবী রেখেছে ভবিষ্যতের জন্যে। তাহলে এত জোর গলায় সে রমেনের ওকালতি না করলেও তো পারত। রমেনকে না ভালবাসতে পারলে আমি বিচ্ছিন্ন একক মানুষদের দলে গিয়ে পড়ব, স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু ভালবাসলে আমি কি উদ্ধার হব? রমেনকে ভালবেসে আমি কোন অবিচ্ছিন্ন সমগ্র দলে গিয়ে পড়ব তা তো সোনার জানা আছে। সে বিষয়ে তো সংশয় ছিল না তার। রমেনকে ভালবেসে আমি খালি সুবিধেবাদীদের দল বাড়াব। বাড়ালাম, আর সত্যিই তো আমি তাই বাড়াচ্ছি! সুযোগ তো আমি কোনদিন অবহেলা করি নি। দরকারে পড়লে সবরকম স্বার্থপরতাই করে থাকি। কিন্তু তা আমাকে উদ্ধার করে নি। তা একটা প্রাতঃকৃত্যের মতো মামুলী অভ্যাসের প্রাণহীন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে কথা সোনা বুক বাজিয়ে কেন বলবে? সে কি জানে না সেই বুক বাজিয়ে বলার মধ্যে সে নিজেকে অস্বীকার করছে, তার পুনর্জন্ম যা সে তিনবছর ধরে নানা রংএ স্বপ্নে আলোড়নে লাভ করেছে তার সর্বনাশ ডেকে আনছে। সে একটা সর্বজনীন জীবনদর্শন গড়ে তুলবার চেষ্টায় যা কিছু দামী, গভীর এবং যা আমাদের জীবনে অনুপ্রেরণা আনে, আমাদের বাঁচার গোড়ায় জল দেয় তা অস্বীকার করছে। তাহলে তার কাছে আমি যাব কেন? সারাদিন

ওষুধের দালালি করে পাড়ার ফ্ল্যাশবোর্ডের মায়া কাটিয়ে দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় গিয়ে তাদের বাড়িতে কাঠের এক তক্তপোষের কোণে ঠেস না দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অত্যন্ত অসোয়াস্তির সঙ্গে বসে থেকে কখন সে বাড়ি ফিরবে ছেলে পড়িয়ে কিংবা থিয়েটারের রিহার্সাল থেকে, সেজন্য অপেক্ষা করব কেন ? সে আমায় কি দেবে ? হিসেব শেখাবে ? বলবে, তুই আরও ভাল করে দালালি কর, ঠিক মতো বিয়েথা করে ঘর সংসারে মন দে ? সে ত আমি নিজেই করব। তার জন্যে সোনার কাছ থেকে কোন পরামর্শ, কোন উপদেশ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। সে রাজপথ আমার সামনে তৈরি হয়েই আছে। সেখানে আমি কোনরকম নড়চড়, সামান্যতম আলোড়নও পছন্দ করব না। কারণ আমার এলেম আমি জানি। আলোড়ন তুললে আমি তা সামলাতে পারব না। আমার এত বছরের নিস্তরঙ্গ জীবনে সে আলোড়ন অত্যন্ত বেয়াড়া ঠেকবে। আমি তাই বেছে বেছে জায়গা খুঁজে গুনে গুনে পা ফেলব। কিন্তু এই সন্তর্পণে হাঁটা আর বাতাসকে ব্যঙ্গ করে ধুলো উড়িয়ে দৌড়নো, এ দুটোর মাঝখানে যে মূল প্রভেদ তা ভুলব কেন ? বরং আমি চমকে উঠব যদি এই গুনে গুনে হাঁটার সময় চেয়ে দেখি সোনাও আমার পেছন নিয়েছে। কারণ তার পক্ষে আলোড়নই তো জীবন, অন্তত যখন থেকে সে তার নতুন জন্ম লাভ করেছে। সেই আলোড়ন গত কয়েকবছর ধরে তাকে দুলিয়েছে, সে দোলা সে ভুলে যাবে ?

বলব কি, সমানে প্রায় দিন পনেরো মনে মনে তর্ক করলাম ঝগড়া করলাম সোনার সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গেও। আর একটু হলে একদিন বাস্ ধরেছিলাম। কিন্তু নিজেকে সবলে সংযত করলাম। কেন ? তার খুব অঙ্কের মতো উত্তর দেওয়া যাবে না। কিন্তু মনে

হল এ আমার পরীক্ষা। আমি মানুষকে কি ভাবে দেখি তার একটা যাচাই হয়ে যাক। আমি না গেলে যে কি হবে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবু অস্পষ্টভাবেও বোধ করলাম আমার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন। যদি রমেনের রাস্তায় সোনা এসে দাঁড়ায় তাহলে সে যাত্রাকে ঠেকাতেই হবে। আমার অনুপস্থিতি কি তাকে ভাবিয়ে তুলবে তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে? সে সম্ভাবনা কম। কিন্তু আমি কেন আমার উপস্থিতি দিয়ে তার চাকরিব নতুন জগত, তার উপলব্ধির নতুন বনিয়াদ পাকা করব? তার স্বকীয় ধর্মে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারব কিনা জানি না। সোনা যেরকম রাখঢাক না করে রমেনকে নিয়ে দাঁড় করাল তার সমস্ত মানুষের প্রতিভূ হিসেবে, তার পানুদা, ফুলওয়ালা, তার মায়াকভস্কি, পল এলুয়ারের পাশে তেমনি কোন ব্যাখ্যা দিয়ে তার চাকরির জগতকেও সে দাঁড কবাবে। তার চোখে রং, মনে রং। সেই রংএ দেখবে তার বড়বাবু সাহেব পিওন, তার সহকর্মীদের। কিন্তু এ রং মিথ্যে, মোহ, নেহাত নিজস্ব মনের মাধুরী। এ মাধুরী যখন মরে যাবে কয়েক বছব পর তখন দাঁত নখ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়বে এ জগত তার ওপর, তখন তাকে রুখবার ক্ষমতা থাকবে না।

থাকতে পারে যদি সে নিজেকে প্রস্তুত করে। নিজেকে অর্থাৎ নিজেব সামর্থ শক্তি সম্ভাবনার সমস্ত দিগন্তকে প্রাণপণে বাড়াবার দুর্দমনীয় চেষ্টায় মাততে পারে। আমার সে মাতা হয় নি। তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। আর আমি কেন? আমার চারপাশের অধিকাংশ তরুণই এ ব্যাপারে অত্যন্ত খর্ব, অসম্পূর্ণ। নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি দায়িত্ব যে মূর্খ অহমিকা নয়, তা এক আজীবন কঠিন এমন কি মর্মান্তিক সাধনা, সে বোধ তাদের মধ্যে নেই। আমি তাই

সযত্নে এ সাধনার রাস্তা থেকে সরে গিয়ে কেবলমাত্র একটি ভদ্র অস্তিত্বকেই বেছে নিয়েছি আমার রাস্তা হিসেবে। যেদিন উপলব্ধি করলাম এ সাধনার বাইরে আমি সেদিনই স্থির করেছি এ প্রসঙ্গে আমার যেন সামান্য অনুযোগও না থাকে। কারণ ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে একটা রূঢ় সত্য আমি অনুভব করেছি—মারি তো হাতি, লুটি তো লাখ। ব্যক্তিত্বের লক্ষ্য অপরিসীম, যা বাধা গ্রাহ্য করবে না, আপস্ করবে না মাঝারি পর্যায়ে নেমে। সে কুলের মুখে কালি দিয়ে শ্যামকে ডেকে আনবে। সে নিজেকে ক্ষমা করবে না, অন্যকে ক্ষমা করবে না। এক অলঙ্ঘনীয় জয়যাত্রার ঝাণ্ডা উড়িয়ে সে সমস্ত বাধার বুকের ওপর দিয়ে তার রথ নিয়ে যাবে মড় মড় করে, দরকার হলে নিজের ওপর দিয়েও।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ আমি কখনই একটা সুখপ্রদ ব্যাপার বলে ভাবতে পারি নি। এমনকি পারিপার্শ্বিকের মঙ্গলজনক কোন অবস্থাকেও ব্যক্তিত্বের সুরাহা বলে ভাবতে শিখি নি। ব্যক্তিত্ব কারও কাছে দয়া ভিক্ষে করে না কিংবা আদর কেঁড়ে বাঁচে না। সে তার আনন্দ লুটে নেয়, তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। আর সে বাঁচায় যেমনি অমৃত তেমনি গরল। সব কিছু লেপে পুছে একাকার করে দেয় এমনি এক সর্বজনসুবোধ্য সুখপ্রদ জীবনদর্শনের স্থান সেখানে নেই। পারিপার্শ্বিকের বাধাও সেখানে এক রোমাঞ্চকর বিষয়বস্তু কারণ বাধা না থাকলে ব্যক্তিত্ব দাঁড়ায় না। সুবিধে বাধা মাখামাখি হয়ে মিশে আছে তার সামনে যেমনভাবে মাখামাখি হয়ে আছে অমৃত আর গরল। মানুষ এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারে নি যে ছেঁকে নিয়ে যেটা চাই সেইটাই পাওয়া যাবে। গরল অমৃত একই সঙ্গে পান না করলে অমৃতের নাগাল মিলবে না।

এক অত্যন্ত শান্ত ভদ্র ছককাটা জীবন যাপন করলেও আমার বোঝার ভুল হয় নি। আর আমার উপলব্ধিই এ সাধনা থেকে আমায় তফাত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। আমাকে ডেকে বলেছে এ পথে কিস্তিমাত হবে না, এখানে মাত করতে গেলে অনেকদিন ধরে চাল আয়ত্ব করতে হবে, তার জন্যে দাম দিতে হবে অনেকখানি। আমি তাই চেষ্টা করেছি আমার শান্ত ভদ্র জীবনে যেন কোন খিঁচ না আসে। আমার মনে কোনরকম সামান্য অনুযোগ, 'আমি কি হতে পারতাম,' এই ধরনের মনোভাব, কিংবা সুযোগ সুবিধে থাকলে আমিও পারতাম' এ ধরনের কোন আফসোস্ স্থান দিই নি। নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছি আমি সেই ব্যক্তিত্বের সাধনার অনুপযোগী। তার জন্যে বিষণ্ণ বোধ করি নি। সত্যি কথা বলতে কি, হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। না বুঝে কোন বোঝার ভার হয়ত নিয়ে ফেলতাম এবং তার জন্যে নাস্তানাবুদ হতাম, এই সিধে সম্ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে খুশিই হয়েছি। এদিকে অনুপযোগী হলেও অন্যান্য যেসব ব্যাপারে নিজেকে উপযোগী করে তুলতে পারি সেদিকে যত্নবান হয়েছি। আমার বাড়ির কিংবা অফিসের অথবা চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে আদানপ্রদানে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছি। আর সে উদ্যোগে আনন্দও পেয়েছি। কিন্তু এ জগতকে নিঃসংশয়ে মেনে নিলেও আমি মানি নি যে এইটাই সত্যের একমাত্র রূপ। আর এক রূপ আছে, আর এক সঙ্গীত আছে। আর সেই রূপ সঙ্গীতময় অস্তিত্বের দিকে তাকিয়েছিলাম এতদিন, আমি হাত পেতে ছিলাম তার নিঃশ্বাস ধরবার জন্যে। সোনার কাছে এসে মনে হয়েছিল সে নিঃশ্বাস গায়ে এসে লাগল, আমি সে রূপের সন্ধান পেলাম।

সোনার চিঠি আমায় ধাক্কা দিয়েছে। সে রমেনকে মনুষ্যজাতির প্রতিভূ হিসেবে খাড়া করেছে। কথাটা আচমকা লাগলেও আসলে ঠিক। রমেন বেশীর ভাগ মানুষের মতো ভালমন্দে মেশা, নেহাত ঘর সংসার করে বাঁচতে চায়। কবির ভাষায় বলতে গেলে, রমেন ধেয়ানের ভাষা চায় না। ধনমানের জন্যেই লালায়িত। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে রমেন শুধু প্রতিভূ নয় রমেনই মানুষের ইতিহাস। এখানে আমার কোন আপত্তি নেই কারণ আমিও তার দলে। আমরা ইতিহাস কিন্তু আমরা ইতিহাস তৈরি করি না। আবহমানকাল ধরে আমরাই তৈরি হয়েছি। আমরা সমস্ত বিধান মেনে নিই, যত্নের সঙ্গে পালন করি। কিন্তু বিধান দিই না। এমন কি যখন কোন বিধান তৈরি হয়, নতুন প্রশ্নের সূত্রপাত হয়, নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খোলে, তখনও আমরা সমাজ হিসেবে প্রতিবাদ করি। আমরা যতক্ষণ না হেরে যাই ততক্ষণ প্রতিবাদ করি। তারপর হেরে গেলে মেনে নিই। আর শুধু মেনে নিই না আমরা সেই নব আবিষ্কৃত সত্যকে সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তাকেই লালন করি। আসলে বেশীর ভাগ মানুষই সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ। আমরা সৃষ্টির উপাদান কিন্তু স্রষ্টা নই। আমরা দ্রষ্টা, আমরা অকর্তা। আমরা যখন জ্বলে উঠি আর আমাদের অস্তিত্বের সম্মিলিত আলোড়নে আকাশ কাঁপতে থাকে তখন আমাদের ভুল করা হয় আগুন ভেবে। কিন্তু আমরা আগুন নই। আমরা কাঠ। আগুন এসে আমাদের জ্বালায়।

আমি জ্বলতে চেয়েছি সেই আগুনে যদিও জানি আমার যা শক্তি তা দিয়ে জ্বালাতে পারব না। সোনার ভেতরে আমি সেই শক্তি দেখেছিলাম, তার ব্যক্তিত্বের আভা আমার গায়ে এসে লেগেছিল।

সে যখন হঠাৎ নিবে গিয়ে নিজের সমস্ত শক্তি সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে রমেনের পাশে এসে দাঁড়াল তখন আমিও নিবে গেলাম।

জানি না সোনা আমার একথা মানবে কি না। সে হয়ত বলবে আমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছি। আসলে পুরুষ আর প্রকৃতির নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব নয়, সমন্বয়ই মানুষের ইতিহাস। কথা যাই হক, এ মিলন শুধু একটা সুখপ্রদ ব্যাপার নয়। প্রকৃতি পুরুষকে জয় করে, ছিঁড়ে নেয় তার অধিকার, তারপর মিলন। মালাবদলের আগে দুর্জয় পরীক্ষা, নিজের সমস্ত অস্তিত্ব বিপন্ন করে সংগ্রাম। নইলে মালাবদল হয় না, নইলে মানুষের সভ্যতা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু আমি যা পারি না তা অন্যের কাছ থেকে চাওয়া কি ঠিক? এ ধরনের চাওয়ার মধ্যে কি প্রচণ্ড অক্ষমতা নেই, নিজে পারে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যকে জলে ঠেলে দেওয়ার মতলব নেই? কিন্তু সোনাকে তো আমি জলে ঠেলতে চাই না, সে তো নিজেই জল কেটে এগোচ্ছে। আমি শুধু চাই সে এমনিভাবে এগোক আমাদের মতো ডাঙায় না উঠে। আমি নিজে অক্ষম নিশ্চয়, জলে নামলে ডুবব কিন্তু তাই বলে দুচোখ ভরে তার জল পার হওয়া দেখব না কেন?

আর এটা আমার অক্ষমতা হতে পারে কিন্তু এটাই আমার ব্যক্তিত্বের একটি মাত্র গুণ যেটার সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা আছে। সোনা যে রমেন শ্যামবাবুদের কথা বলেছে আমি তাদের এক চুল উঁচুতে নই। অনেক অংশে তারা আমায় চেয়ে আরও ক্ষমতাবান। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে আমি তফাত। তারা ঠিক আমার মতো তাদের অস্তিত্বের বাইরে তাকিয়ে নেই। এই সর্বদা আমার ধীর স্থির

শান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে থেকেও এক অনির্দিষ্ট মহত্বের পানে তাকিয়ে থাকা আমার জীবনে অশান্তি এনেছে। আর আশ্চর্যের কথা হতে পারে কিন্তু সেই অশান্তিই আমার বাঁচার একটা মস্ত প্রেরণা, আমার আত্মজ্ঞানের মূল ভিত্তি। সেই অশান্তিই আমাকে আমার অস্তিত্বের বাইরে টেনে নিয়ে আমাকে আর আমার বন্ধু পরিবার পরিজনকে সোনার দাদামণির সেই সৌরজগতের মাঝখানে স্থাপন করেছে। সোনার বাড়ি না যাওয়া, টাকা জোগাড় করার সঙ্গতি থাকলেও তার মাকে টাকা না পাঠানো, তার বন্ধুত্বের প্রসারিত হাত গ্রহণ না করা এ সমস্ত ব্যাপারই কোন চেষ্টা করে করতে হয় নি। মনে হয় নি যে আমি মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে একটা বিদকুটে এক্সপেরিমেণ্ট করছি। বরঞ্চ এটাই মনে হয়েছে যে আমি যেটা করছি সেটাই ঠিক, সেটাই মনুষ্যত্বকে সম্মানদান, তার মূল্যে আস্থা স্থাপন করা। কাজেই সোনার এই নতুন পর্যায়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার চেষ্টা যে আমার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সমর্থন পাবে না সে কথাটা আমার আচরণের মারফত একেবারে নির্দন্দ্বে জানিয়ে দেব স্থির করলাম।

কিন্তু তত্ত্বটা মানুষের মন থেকে আলাদা না হলেও তার সঙ্গে মন মেলাবার চেষ্টা করতে হয়। সেটা সব সময় প্রফুল্ল ভাবে করা যায় না। তার জন্যে হয়ত মুখ গম্ভীর হয়ে পড়ে, অন্যের কাছে নিজেকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখায়। বোধ হয় এরকম কিছু একটা আমায় দেখাচ্ছিল কদিন থেকে নইলে খাওয়ার সময় বা কয়েকদিন মাঝে মাঝে কথা থামিয়ে অমন চোখ ছোট করে বাবা আমার দিকে তাকাবেন কেন? দু দিনই হঠাৎ কিরকম মনে হল বাবা আমার দিকে চেয়ে আছেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। কাল হঠাৎ বলেই ফেললেন। "কি হয়েছে রে তোর? রিট্রেঞ্চমেণ্ট হবে নাকি অফিসে?"

আমি চমকে উঠি। তারপর হেসে কথাটা উড়িয়ে দিই।

বাবা বললেন, "তোরা আজকালকার ইয়ংম্যানরা বড্ড শুকনো হয়ে গেছিস। বড্ড হিসেব করিস। এত হিসেব করিস কেন রে?"

"না না হিসেব করছি না মোটেই," প্রসঙ্গটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করি।

বাবা হেসে বললেন, "তাহলে কি করছিস? প্রেমে টেমে পড়লি, বয়স তো হল।"

বাবার কথায় আমি আশ্চর্য হলাম না। তাঁর চেহারা দেখলেই আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। পাতলা, ছোটখাটো মানুষটি, ধুতির ওপর চিরকালের হাফসার্ট, কানের পাশে সাদা চুলগুলোর দিকে না তাকালে ঠিক ঠাওর হয় না লোকটার বয়স হয়েছে। আর তাছাড়া বাবার চাউনির মধ্যেও কেমন একটা চাপা বিদ্রূপের ভাব আছে। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি। যখন খুব হৈহৈ করে বিজ্‌নেস করেছেন, অনেক টাকার লেনদেন করেছেন, মস্ত বড় অফিস খুলেছেন তখনও তাঁর চালচলনে এমন একটা ভাব ছিল যাতে মনে হতে পারে লোকটা যা করে যাচ্ছে তার প্রতি তার খুব আকর্ষণ নেই, বিজ্‌নেসের খেলাটা তাঁর ভাল লাগে সেইজন্যেই খেলছেন। কোনদিনই কোন ব্যাপারে লোকটাকে অভিভূত হতে দেখলাম না, এমন কি মা যখন মারা গেলেন তখনও। মা মারা যাবার কয়েকদিন পরই শুনলাম বাবা বৈঠকখানায় বসে চেঁচাচ্ছেন, "ভাগ্যবানের বৌ মরে, বুঝেছ হে, তোমাদের ওসব আহা উহু আমাকে শুনিও না।"

বাবার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, "কি যে বল, কখন সময় পাই। অফিসে যে রকম খাটতে হয়।"

বাবা আমায় হুশহাবাস করে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "দূর,

এরকম কানে কলম গুঁজে বসে থাকলে কি প্রেম করা চলে।" হেসে আমার আপাদমস্তক একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "আমরাও তরুণ ছিলাম, বুঝলি।"

"তুমি তো এখনও আছো।"

"দূর বলিস নে, লোকে শুনলে ছি ছি করবে।"

বাবার কথায় এ কথা খুব স্পষ্ট যে লোকের কথা তিনি মানেন না। তিনি বোধহয় নিজেই বিশ্বাস করেন না তিনি বুড়ো হয়েছেন। সত্যিই বাবার পাশে দাঁড়িয়ে অনেক সময় নিজেকেই বুড়ো লাগে। এখনই তাঁর বাদামী চোখ দুটো কথা বলার সময় যখন চকচক করে উঠল তখন সন্দেহ হচ্ছিল লোকটা বুড়ো হয় নি।

আবার বললেন, "তোরা বড্ড হাফসে যাস আজকাল। কেন এত হাফসে যাস বলতো।"

অবাক হয়ে বললাম, "হাফসানো আবার কোথায় দেখলে?"

"হাফসানো নয়? এই চাকরি করতে গিয়ে হাফসে গেলি। সংসার করতে গিয়ে হাফসে গেলি। আমার অনেক তরুণ বন্ধু আছেন তাঁরা শুনি প্রেম করতে গিয়ে হাফসে যান। তারপর যখন সংসার হল তখন খালি খিটিমিটি। কেনরে, এত হাফসে যাস কেন?"

বাবার দিকে তাকিয়ে আমার হিংসে হচ্ছিল। অতীতের অনেক কাহিনী মনে পড়ছিল। বাবার কাণ্ড ভাবতেও মজা লাগে, হিংসেও যে হয় না তা নয়। মার অসুখের সময় তাঁর কি যত্ন। দু বছর মা ভুগেছিলেন। কোনদিন তাঁর সেবার ভার নিতে দেন নি আমাদের। সমস্ত খুঁটিনাটি নিজেই করেছেন। মার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা লক্ষ্য করতাম। এমন হেসে খেলার ছলে তাঁর স্বামিত্বটা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন যে মার কিছু বলবার ছিল না। মাঝে মাঝে বলতেন যে

-না তা নয়। বাবা কোথাও গিয়ে একটা গোলমাল বাধাবেনই এ সম্ভাবনা অহরহ তাঁকে কি রকম বিঁধত মা আমাদের কাছে তা গল্প করেছেন। তারপর সেই সম্ভাবনা যখন একটা প্রাত্যহিক ঘটনার মতো দাঁড়িয়ে গেল তখন তিনিও তা মেনে নিলেন। পরের দিকে বাবার তরফ থেকে কোন রকম অঘটনই তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হত না। বাবা প্রত্যেকবারই এক গাল হেসে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই চীৎকার করতেন, "মিনু, চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলাম।" (বাবা তাঁব আদরের ডাকগুলো ছেলেমেয়েদের সামনে বলতে বিশেষ ইতস্তত করতেন না। আর একটা তাঁর ডাক ছিল, 'ভুঁটি'। মার একটু মোটার ধাত ছিল)।

বাবার সেই উল্লাসভরা মুখখানার দিকে তাকিয়ে মা আর কি করবেন। বলতেন, "তাহলে আর কি হবে। আমার মাথা কিনেছো। এখন এসো, খেয়ে আমায় ধন্য কর।"

লক্ষ্য করতাম মা চেষ্টা করতেন রাগ করে কথাগুলো বলতে। কিন্তু বলতে গিয়ে প্রায়ই হেসে ফেলতেন। তারপর চলত আমাদের কচু ভাতের পালা, এমন কি মার পাশের বাড়ি থেকে চাল ধার করে আনা। আর ঠিক এই রকম দুঃসময়ের মাথায় বাবার ঝড়ের মতো আবির্ভাব হত। ঠিক আগের বারের মতো হেসে চীৎকার করে বলতেন, "মিনু,, চাকরিটা হয়ে গেল। যা একখানা বক্তৃতা দিলাম। বোর্ডের মেম্বাররা একেবারে তাক মেরে গেল।" তারপর হাত মুখ নেড়ে মেডিক্যাল বোর্ডের মেম্বারদের কেমন তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তার বর্ণনা করতে লেগে যেতেন।

মা এবার হেসেই বলতেন, "আমার মাথা কিনেছো, এবার চারটি খেয়ে ধন্য কর।"

আর একটা ভারী মজার গল্প আছে বাবাকে নিয়ে। আমরা তখন ঢাকায়, ইস্কুলে পড়ি। বাবার হঠাৎ খেয়াল চাপল ইলেকশানে দাঁড়াবেন। মনে আছে, বাবার সমস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব তাঁকে এই খেয়াল থেকে বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাবাকে রোখা গেল না। তিনি দাঁড়ালেনই শেষ পর্যন্ত। মার চুড়ি হার বিক্রি করে লরি ভাড়া করা হল, ভলাণ্টিয়ারদের চায়ের ব্যবস্থা করা হল। ডাক্তার হিসেবে বাবাকে লোকে শ্রদ্ধা করলেও তিনি কোন দলেরই টিকিট পেলেন না। কংগ্রেসের চার আনার সভ্য ছিলেন, তরুণ বয়সে জেলেও গিয়েছেন। কিন্তু যথেষ্ট পয়সা ছিল না তাঁর। তার ওপর যাকে বলে ঘাঁতঘোত বা কূটনীতি যা রাজনীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ তাও তিনি ভাল বুঝতেন না। তাই সেখানে কোন পাত্তাই পেলেন না। বামপন্থী অনেক নেতাদের তিনি চিকিৎসা করেছেন কিন্তু তাঁদের যে সব চুলচেরা নিয়মকানুন তা মানা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই শেষকালে দাঁড়ালেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়ে। এখনও সে ঘটনা ভাবলে আমি সিঁটিয়ে যাই। বাবা কিন্তু এখনও মজা করে বলেন সে কাহিনী। প্রায় হাজার দশেক পেয়েছিল বিজয়ী দল, দ্বিতীয় দল একটু নিচেই। বাবা পেয়েছিলেন একশো সাতটা ভোট। আমাদের বাড়ির কটি লোক (আমাদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের বেশীর ভাগই বাবাকে ভোট দেন নি) আর কাছে রেলওয়ে ইয়ার্ডে বাবা যাদের চিকিৎসা করতেন এমনি কয়েকজন রেলের শ্রমিক। যে সমস্ত রুগীকে বাবা মৃত্যুর দরজা থেকে ছিনিয়ে এনেছেন তারা যখন আলোয়ানে মুখ ঢেকে অন্য দলের ভলাণ্টিয়ারের হাত ধরে ভোট দিতে চলে গেল তখন আমি বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। বাবা তখন বিড়বিড় করেছেন, "শালারা কেমন বুঝেসুঝে ভোট দিচ্ছে,

দেখেছিস। ঐ শালাটার টি. বি. হয়েছিল। আর ঐ যে একটা যাচ্ছে, আমার মুখের দিকে চাইতে পারছে না ব্যাটা। ব্যাটা আবার আসুক না, ঠেঙিয়ে তাড়াব।"

কিন্তু তখনও কিংবা সন্ধ্যেবেলা যখন ড্রাম বাজিয়ে ভলান্টিয়াররা লরিতে করে এসে আমাদের বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে একেবারে কানে তালা লাগিয়ে দিল, আর তাদের একজন কিছু পরিমাণ গোবর জল ছিটিয়ে সম্বর্ধনা জানাল বাবাকে, যখন রাগে দুঃখে আমার গলা বুঁজে এসেছিল, মা কাঠের পুতুলের মতো বসেছিলেন জানলার শিক ধরে তখনও মনে হয়েছিল লোকটা যাকে বলে ঠিক বিচলিত হওয়া সে রকম কিছু হয় নি। বন্ধুরা সমবেদনা জানাতে এলে তাঁদের খুব শান্তভাবে বলেছিলেন যে সামনের বার তিনি আবার দাঁড়াবেন ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হয়ে। সৌভাগ্যবশত পরবর্তী ভোটের সময় আমরা আসামের জঙ্গলে।

কিন্তু এত রকম ঘটনা ও দুর্ঘটনার মধ্যে নিজেকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়েও বাবার মন এখনও টাটকা। কোন ঘটনাই তাঁর পা থেকে মাটি সরিয়ে নিতে সমর্থ হয় নি। আবার কোন সুখই তাঁকে স্মৃতির অতলে পাঠাতে পারে নি। বাবার জীবনের ঘটনার যদি অর্ধেকও আমার জীবনে ঘটত তাহলে তারই জের টেনে আমার সমস্ত জীবনটা কেটে যেত। কিন্তু বাবা কিছুরই জের রাখেন না। মাঝে মাঝে তাঁকে আমার যে একটু হৃদয়হীন মনে হত না তা নয়। কিন্তু সুখে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন হলেও তিনি বীতস্পৃহ হন নি। কোন ব্যাপারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন না তার কারণ বাঁচাটা তাঁর কাছে একটা মস্ত মজার ঘটনা ছিল। আর আমার কাছে অসম্ভব মনে হলেও তাঁর মতো মানুষের পক্ষে বোধহয় সুখও যেমন মজার দুঃখও তেমনি। এমন কি তাঁর অনুরাগের ভেতরেও

একটা ঠাট্টা ছিল। আমার মার সঙ্গে আলাপে আমি তা প্রায়ই লক্ষ্য করতাম। মাকে এমনভাবে বিদ্রূপ করে উঠতেন কখনও কখনও যে মা বেশ হকচকিয়ে যেতেন। একবার যেমন ঝপ করে বলে বসলেন, "ছাখো, নিরানব্বইটা মেয়েমানুষই ভোগে হিস্টিরিয়ায়। তুমিও কিন্তু তার মধ্যে একজন।" তারপর মার করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে সশব্দে হেসে উঠে বললেন, "আর পুরুষ মানুষ, একেবারে বদ্ধপাগল।" এমনিভাবে যখনই কোন কথা জোর দিয়ে বলেছেন পরমুহূর্তেই তিনি তা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে একজন উঁচুদরের শিল্পী মনে হত যিনি নানা রংয়ে ফেলে এ জগতকে দেখতে চান, যাঁর কাছে শেষ বলে কিছু নেই, কোন সিদ্ধান্ত যিনি মানেন না।

তাই বাবা যখন সেদিন জিজ্ঞাসা করলেন কেন আমরা তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে উঠি তখন কোন জবাব দিই নি। আর কিই বা জবাব দেব? সত্যিই তো কোন রকম চেষ্টা না করেই হাঁপিয়ে উঠি। তার কারণ কি করে বলব? বিরক্তির সঙ্গে তিনিও তো কম সংগ্রাম করেন নি। কিন্তু বিরক্তি তাঁকে পেয়ে বসে নি। আর আমায় শুধু বিরক্তিই পেয়ে বসে নি, আরও একটা কিছু. আরও কোন শক্তিমান শত্রু, এক ধরনের নিস্পৃহা পেয়ে বসেছে। আর এই নিস্পৃহ জগতে বাস করেও একটা স্পৃহা আমার বাঁচার গোড়ায় জল দেয়। যারা নিজেদের বিপন্ন করে, যারা নিয়তিকে ডেকে ডেকে কলা দেখায় তাদের জন্যে আমি প্রচণ্ড মমতা বোধ করি।

সাত

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে চা খাচ্ছি এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকলেন। ধুতির ওপর সাদা হাফ শার্ট, পায়ে স্লিপার, হাল্কা পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে টেবিলের ওপর কতগুলো কি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "ত্যাখ দেখি কোনটা পছন্দ হয়।"

অবাক হয়ে বললাম, "কি ব্যাপার ?"

"কি আবার ব্যাপার। পাত্রীর ফটো। ভাল করে দেখে বল কোনটাকে মনে ধরেছে।"

আমি খুব আশ্চর্য হয়ে যাই। বাবা আমার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছেন আর ব্যাপারটা এতদূর এনে ফেলেছেন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। বাবাকে যতদূর জানি তাতে তো তিনি মেয়েদের ফটো চাইবার আগে আমাকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদিও আমার তেমন কোন পরিচিত মেয়ে নেই যাকে অদূর ভবিষ্যতে বৌ হিসেবে কল্পনা করতে পারি তবু আমাকে তো তিনি একবার জিজ্ঞেস করবেন। এ ধরনের কাজ তো জেদী বাপেরা করেন। তাঁরাও তো সময়ের গতিক বুঝে নিজেদের অনেক মানিয়ে নিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁদের সঙ্গে বাবার তুলনাই হয় না। আমি কিছু না বলে যে রকম বসেছিলাম সেইরকমই বসে রইলাম।

বাবা আমার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, "ত্যাখ, তুই যা ভাবছিস তা নয়। ছেলের বিয়ের জন্যে যদি আমায় মাথা ঘামাতে

হত তাহলে আমি একটা অন্য মানুষ বনে যেতাম। তুই বিয়ে করবি সেটা তোর ব্যাপার।”

“তবে আমার ব্যাপার নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

“মাথা ঘামাচ্ছি? মোটেই না। তুই বল আমি এখনই জানলা গলিয়ে ছবিগুলো ফেলে দিচ্ছি,” বাবা এমন উঠবার ভঙ্গী করলেন যে মনে হল সত্যিই এখনই উঠে টেবিলে ছড়ানো ছবিগুলো ফেলে দেবেন।

বললাম “তাহলে তুমি আনলে কেন ছবিগুলো?”

“ব্যাপারটা শোন আগে। রতন চাটুজ্জের বাড়ি আজ সকালে নেমন্তন্ন ছিল। ব্যাটা খুব খাওয়ালে। অনেক রকম মাছ, শুকতো। এমন কই-শর্ষে অনেক দিন খাই নি। তোর মা যাবার পর থেকে এ্যাদ্দিন পর্যন্ত……”

বিরক্ত হয়ে বললাম, “বেশ বেশ, কই-শর্ষে খেয়েছ, বেশ করেছ, কিন্তু ছবিগুলো আনলে কেন?”

“ছবিগুলো টেবিলে পড়েছিল। ওঁর ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করছিলেন এমন সময় ছেলে এফ. আর. সি. এস. পড়তে বিলেত গেল। বিয়ে করে সে বিলেত যাবে না। আমায় রতন বললে, ‘ওগুলো তুমি নিয়ে যাও। তোমার ছেলেও তো বিয়ের যুগ্যি হয়েছে।’ আমি তাই পকেটে ফেলে রেখেছিলাম। ফিরে এসে আবার ধোবার কাপড়ের মধ্যে ফেলেছিলাম শার্টটা। এখন মনে পড়ল। তুই ফেলে দিতে পারিস, আমার কোন আপত্তি নেই।”

বাবা এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে আমি রাগ করতে পারলাম না। বললাম, “বৈঠকখানায় তো এখন কেউ নেই, একটু বসো না।”

বাবা আমার কথা শুনতে পান নি মনে হল। বললেন, "তোর বয়স কত হল?"

"আটাশ পার হলাম।"

বাবা হেসে বললেন, "তাহলে তো তোর বিয়ের যুগ্যি বয়স হয়েছে।"

"হ্যাঁ তা হয়েছে।"

"তোর কি কোন মেয়ে মনে ধরেছে?"

আবার সেই বাদামী চোখ তুলে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কেমন মনে হল লোকটা আমাকে ঠাট্টা করছে। ঠিক ছেলের বাবা যেরকম গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্ন করে এ প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্নের চেয়েও তাঁর বলার ভঙ্গীতে এমন এক ইয়ারী ভাব ছিল যে আমি ঠিক মতো উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেলাম।

বাবা বললেন, "মানে আমি বলছি, কিছুদিন পর সম্বন্ধটা পাকবে এরকম কিছু?"

তাঁর চাউনি, গলার স্বরে এমন হালকা ঠাট্টা, এমন সংক্রামক মজার ভাব যে আমিও না হেসে পারলাম না। বললাম, "না, সেরকম কিছু হয় নি।"

"এ্যাদ্দিনে কত ঘাস কাটলি?"

এবার তিনি প্রকাশ্যেই বিদ্রূপ করলেন। এতক্ষণ ঠিক এই ভয় করছিলাম। তিনি একটা কিছু বলে বসবেন আর আমি মেজাজ খারাপ করে ফেলব এই আশঙ্কায় আগে থেকেই কেমন সিঁটিয়ে ছিলাম। এখন অবস্থা আরও বেকায়দাজনক লাগল।

বাবা হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা, সত্যি করে বলতো, মেয়েদের সঙ্গ কি তোর ভাল লাগে না?"

"ভাল লাগে না আমি তো বলি নি।"

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, "তাই বলছিস, তুই তাই বলছিস, তোর সমস্ত চালচলনে তাই বলে চলেছিস। আর আমি? আমি ছিলাম মেয়েদের সঙ্গ বলতে পাগল। এক্কেবারে পাগল। তখন কি কড়া পাহারার দিন! আজকের মতো-ঢিলেঢালা ব্যাপার না। কিন্তু এত পাহারা ছিল বলেই বোধহয় এত ভাল লাগত। আমার কি আশ্চর্য লাগে ভাবতে, তুই এতগুলো বছর পার করে দিলি অথচ একটা মেয়ের সংস্পর্শেও এলি না, একটুও টান বোধ করলি না।"

বাবা সাধারণত এরকম উত্তেজিত হন না। তিনি এমন উষ্ণভাবে নিজের সম্বন্ধে খোলাখুলি কথাগুলো বললেন যে তাঁর একমুহূর্ত আগের বিদ্রূপ ভুলে গেলাম। আমার এক নতুন অসোয়াস্তি হতে লাগল। বাবা যদি তাঁর অতীত কাহিনী বলতে শুরু করেন তাহলে কি আমি সহ্য করতে পারব? নিজেকে তিরস্কার করলাম। যখন লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করি তখন তাঁর ছোটখাটো 'পদস্খলন'কেও সহ্য করতে পারব না কেন? কিন্তু পদস্খলনের কথা লোকে স্মরণ করে একটু লজ্জা পেয়ে। কিন্তু বাবার মুখে লজ্জার চিহ্ন নেই। তাঁর ষাট বছরের মুখখানা ঝকমক করছে আনন্দে, তাঁর দুচোখে সে আনন্দের দাগ, তাঁর ঠোঁটের দুপাশে আনন্দের দাগ, হাফ হাতা শার্টের ভেতর থেকে বার করা দু খানা লম্বা হাতেও সে আনন্দ। আমি মাথা নিচু করলাম। সে আনন্দের দিকে তাকাতে আমার লজ্জা হল।

বাবা স্বগতোক্তি করছেন এমনভাবে বলেন, "তখন তো তোর চেয়েও ছোট। কলেজ থেকে সবে বেরিয়েছি, আমারই এক রোগিনীর সঙ্গে প্রেমে পড়লাম। এখনও তার মুখটা মনে পড়ে। টান টান চেহারা (আমার ঘাড় আরও নিচু হয়ে যাচ্ছিল)। মুখখানা এখনও ভুলতে

পারি নি। যখন জানলাম তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে, দু তিন মাস পরই তার বিয়ে হয়ে যাবে, তখন কি কষ্ট! আমার কাছ থেকে একটা আংটি সে চেয়ে নিয়েছিল। কি অদ্ভুত মানুষের মন! বিয়েও করতে যাচ্ছে আবার আমার জন্যে কেঁদেও ভাসাচ্ছে। তবে কি জানিস, আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগে। সে চোটের পর ভেঙ্গে পড়ি নি। একটা কি দুটো বছর আমার ভাল লাগার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম, নার্ভগুলো বোধহয় শুকিয়ে গিয়েছিল। আবার ভাল লাগতে শুরু করল। উঃ কতদিন চলে গেছে তারপর। কিন্তু কটাই বা দিন ভাবতে গেলে। মাত্র চল্লিশটা বছর।"

আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "তুমি তো মাকেও ভালবাসতে?"

বাবা এতক্ষণ পর আমার দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন। তাতে বিদ্রূপের গন্ধ ছিল না। আমার ধড়ে প্রাণ এল। মনে হল লোকটা সত্যিই আমার বাবা। আমাব দিকে চেয়ে বললেন, "তার কৈফিয়ত কি আমি তোকে দেব রে বোকা?" পরমুহূর্তেই ঠাট্টার মেজাজে ফিরে এলেন। বললেন, "নাঃ, ভালবাসতাম না, একদম না। কি নির্দয় লোক আমি, না রে?"

আমার বুদ্ধি ফিরে এল। বললাম, "লোকটা তুমি ভালই। সার্টিফিকেট দেবার আগে একটু বাজিয়ে দেখছিলাম।"

বাবা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ছাখ, তোর স্বভাবটা বড্ড গেঁতো। বিয়ে করা সম্বন্ধে তোর কোন আলাদা সাড় নেই। তাই তোর মতো লোকের পক্ষে একটা টপ করে বিয়ে করে ফেললে কোন ক্ষতি নেই। কারণ ও ব্যাপারটা তোর কাছে খুব বড় একটা ব্যাপার নয়। আর এক নতুন অফিস হবে আর কি!"

ভেতরে ভেতরে চটলেও সামলে নিলাম। বাবা আমায় খোঁচা দেবার জন্যে কথাটা বলছেন না। একটা সত্য আমার কাছে অপ্রিয় লাগতে পারে কিন্তু তাহলেও তা সত্য। আমার বিয়েটাও আমার একটা অফিস, আর এক নতুন কর্তব্য। বাবা চমৎকার ধরেছেন। আমি মনে মনে তাঁকে তারিফ না করে পারি না। বলি, "আর তোমার কাছে কি বিয়ের রাজ্যটা একেবারে স্বর্গের রাজ্য মনে হত?"

"না, একেবারে তা নয়। খুব মর্তের রাজ্যই ভাবতাম। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার খুব একটা জোরালো অনুভূতি ছিল। মনে কর, সে যুগেও আমি তোর মাকে দেখেশুনে বিয়ে করেছি। (মায়েদের পাশের বাড়ির বাসিন্দে ছিলেন বাবা)। কিন্তু সে সময় দেখেশুনে বিয়ে করবার মুহূর্তেও ভেবেছি। স্বর্গের রাজ্য হলে তো ভাবনার কথা ছিল না। মনে আছে বিয়ের ঠিক আগের দিন। একেবারে সোজা ভাবী শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠলাম। আমার শ্বশুর শাশুড়ী কেন, পাড়পড়শী সবাই চমকে গিয়েছিল। তোর মা তো ভয়ে কিংবা কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনায় কাঠের মতো দাঁড়িয়েছিল। তখনও আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি। এখন বোধহয় এসব প্রশ্নের কোন মানে হয় না কিংবা এসব নিয়ে লোকেরা মাথা ঘামায় না অত।"

"কি জিজ্ঞেস করলে?"

বাবা হেসে বললেন, "তাও বলে দিতে হবে। যে প্রশ্ন আমার সব সময় মনে ছিল, যে খুঁত-খুঁতে ভাব আমার আজীবন সঙ্গী। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "আমি তোর মাকে বলেছিলাম আরও ভাল করে ভেবে দেখতে আমায় সে ঠিক····· মানে আমার প্রতি তার টান ঠিক মতো যাচাই করেছে কি না। যদি না

করে থাকে আর আমার উৎসাহতেই খালি এগিয়ে এসে থাকে তাহলে তার আমায় প্রত্যাখ্যান করাই ভাল।”

“মা কি বললেন?”

“কি বললেন? কিছু বলেন নি, খালি কেঁদেছিলেন। আমি চেয়েছিলাম আমায় ধমক দেবে, বলবে, এসব ভাবনা না ভেবে বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে, কিন্তু সে শুধু কাঁদল। খালি আমি যখন যাচ্ছি তখন সমস্ত শরীরখানা যেন তার চাউনিতে ঢেকে দিয়ে তাকাল আমার দিকে। ভারী মন নিয়ে ফিরলাম।”

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, “সে সব কথা থাক। তোর যখন দেখে শুনে বিয়ে করার ব্যাপারে কোন হুঁশ নেই তখন এমনি পাত্রী দেখে বিয়ে কর না, কি কিছু বলছিস না যে।”

বললাম, “পাত্রী ‘দেখে’ বিয়ে করতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তবে কোম্পানির সঙ্গে এখন আমাদের ইউনিয়নের ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে। অদ্ভূত অবস্থা। হাতবদল হতে পারে শুনছি।”

বাবা সশব্দে হেসে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, “গ্র্যাণ্ড, গ্র্যাণ্ড। তোকে আমি সত্যিই তারিফ করি। আমি কোন দিন হিসেব করলাম না আর তুই এমন হিসেবের রাজা হলি কেমন করে বলতো। আমায় একটু শিখিয়ে দে না।”

হেসে বললাম, “ওসব তোমার মাথায় ঢুকবে না। আমি তো তোমার মতো এক পেট ক্ষিধে নিয়ে জন্মাই নি। আমার ক্ষিধেটা কম। তাই ভেবে চিন্তে খেতে হয়। কোনটা আজেবাজে, কোনটায় যাকে বলে খাদ্যপ্রাণ আছে এ সবগুলো ভেবে দেখতে হয়।”

বাবা আমার দিকে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। তারপর

হঠাৎ উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর ছড়ানো ফটোগুলো থেকে একটা টেনে বার করে নিয়ে বললেন, "তাহলে তোর পক্ষে এটাই ভাল। সঙ্গে একটা স্লিপ এঁটে রেখেছে চাটুজ্জে। পড়ে ত্যাখ, খুব খাদ্যপ্রাণ আছে এটার।"

আমার কিরকম মজা লাগে। বলি, "আচ্ছা, নিয়ে এসো তো ছবিগুলো।"

তারপর বাবাকে বিছানার ওপর ফটোগুলো সার সার সাজিয়ে রাখতে বলি তাঁর পছন্দ অনুযায়ী। বাবাও এ খেলায় হঠাৎ মেতে উঠলেন। এক একটা ছবি আলোর নিচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, তার সঙ্গে যে স্লিপ সেটা পড়েন মনোযোগ দিয়ে চশমা পরে, আবার চশমা খুলে একবার দূর থেকে শেষবারের মতো পরীক্ষা করে বলেন, "এইটা হবে এইখানে। তোমার মা খাদ্যপ্রাণ একটু কম মনে হচ্ছে।"

কৌটা থেকে আমায় একটা সিগারেট দিলেন আর নিজে নিয়ে ধরালেন। এ রেওয়াজ বাবা পত্তন করেছেন আমার কলেজ জীবন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম প্রথম আমার অসোয়াস্তি হত তারপর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আর কিছু মনে হয় না। খাটের এক কোণে কাত হয়ে শুয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম।

সিগারেটটা শেষ হবার একটু আগে বাবার ছবি সাজানো শেষ হল। বললাম, "কি হয়েছে? এতক্ষণ কি, করছো? আমি হলে দু মিনিটে সাজিয়ে ফেলতাম।

বাবা চশমা মুছতে মুছতে শেষবার ছবিগুলো দূর থেকে পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ, এইবার হয়েছে।"

উঠে বসলাম। খাটের এককোণে তাসের মতো দশ বারোখানা ছবি রাখা হয়েছে। প্রথমটা টেনে নিলাম।

আলোর সামনে ছবিখানা নিয়েই আমি চমকে উঠলাম। এরকম ছবির জন্যে প্রস্তুত ছিল না আমার মন। সাজ আভরণ কিছু নেই। একটা কচি মেয়ে বলতে গেলে, জলজল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মেয়েটি সাধারণ বিচার অনুযায়ী সুন্দরী নয়। শরীর এখনও অপরিণত, কণ্ঠার হাড় খুব স্পষ্ট, চুল ফেরানোর মধ্যে কোন ছাঁদ নেই আবার খুব সাধারণত্বও নেই। যে কথা খুব সহজে মনে আসে তা হল এক তপস্বিনীর ভাব। সেই ভাব সমস্ত চেহারা জুড়ে। কিন্তু তার চিবুক, তার ঘাড়, তার কপাল, তার কাঁধের সঙ্গে লেপে থাকা সংযত চুলের কঠিন বিন্যাস এ সমস্ত ছাপিয়ে তার চোখ দুটো চেয়ে আছে। সে চাওয়ায় বিষাদের লেশমাত্র নেই, ঔদাসীন্য নেই, আবার উচ্ছলতাও নেই। সে চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চোখ নামালাম, আধশোয়া ভঙ্গী ছেড়ে উঠে বললাম। নিচে স্লিপে ডাক্তার মুখার্জীর যে লেখা তা থেকে মেয়েটির পরিবেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। বাপের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, অনেকগুলি ভাইবোন। ফটোখানা রেখে দিয়ে আমি দ্বিতীয়টা টেনে নিলাম।

বাবা একটু ম্লান হেসে বললেন, "কিরে মনে ধরল না?"

"না, একটা সিগারেট দাও।"

দ্বিতীয় ছবিখানা বিশেষ কিছু ব্যাপার না। আমি আবার শরীর এলিয়ে দিলাম। মেয়েটি খুব উচ্ছল হবার চেষ্টা করেছে। খুব এক লাস্যময়ীভাব ব্লাউজের কাট্ থেকে শুরু করে তার চোখের চাউনি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে সুন্দরী। কারণ স্লিপের এক কোণে চ্যাটার্জি সাহেবের নোট আছে; গায়ের রং খুব ফর্সা, সত্যিই ফর্সা বলা যায়। খুব স্পষ্ট যে মেয়েটি একেবারে সার্থক ফটো তোলবার জন্যে উদগ্রীব। একটুক্ষণ চেয়ে থাকলে বোঝা যায়

খুশিভাবখানা গাল আর চোখে সমানভাবে জমাট বাঁধে নি। তার চোখ দুটো যেন বলছে, "আমায় ঠিক খুশি দেখাচ্ছে তো?"

তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম মায় ষষ্ঠ পর্যন্ত সব এক। একটু এদিক ওদিক আছে, বাড়ির অবস্থায় সামান্য হেরফের আছে। এমনি চেহারায় খুব কোন পার্থক্য মালুম হয় না। প্রায় সকলেরই মুখে কেমন যেন ঘুম-ঘুম আদুরে ভাব। তারা সকলেই 'সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা।' যে কোন একজনকেই পছন্দ করা যেতে পারে। তারা সকলেই বোধহয় আমার মতো, বাবার মতো নয়। তারা সকলেই বিয়ে করছে কারণ বিয়ে একটা কর্তব্য। ছবি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। কোথায় যেন একটা বড় রকম মিল আছে বাবা আর সোনার মধ্যে। যে মেয়ে বিয়ের বাজারে পাত্রী হিসেবে একেবারে লাষ্ট তাকে অবলীলাক্রমে বাবা পছন্দ করলেন তাঁর ভাবী পুত্রবধূ হিসেবে। সোনারও ভাল লাগার মধ্যে এরকম বেহিসেবী দাপট আছে। কিন্তু বাবা এই দাপট বেশ চালিয়ে গেলেন সারাজীবন, কোনদিন মাথা নোয়ালেন না। আর সোনা এমন কি অবস্থায় পড়েছে যে নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্যে এমন উঠে পড়ে লাগল?

অন্যমনস্ক হয়ে শেষের কখানা ছবি ঘাঁটছিলাম। সে অবস্থাতেই একটা ছবি তুলে ধরেছিলাম। মেয়েটি অফিসে কাজ করে, চেহারা দেখে প্রায় আমার সমবয়সীই মনে হল। দীপ্তি হয়ত ছিল এক কালে, এখন নিবুনিবু। একটু ক্ষয়া ভাব আছে, তবে সে ভাব শুরু হয়েছে সবেমাত্র। আত্মীয় বলতে দূর সম্পর্কের এক মামা বর্তমান। মেয়েটির চেহারা, তার পরিচয় থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে তার চাওয়া খুব বেশী নয়। সে একটুখানি সুখের কাঙাল, সে একটু বিশ্রাম চায়। যে দুর্লভ অগ্নি-

শিখাকে প্রেম বলা চলে তার সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্খাও যেমন তার নেই তেমনি প্রেম বলতে যে মামুলী ঢং তাও তার মধ্যে অনুপস্থিত। সে মেনেই নিয়েছে আমার মতো যে তার বিবাহিত জীবন আরও একটা অফিস হবে। তার জন্যে তার কোন ক্ষোভ নেই। শুধু তার লক্ষ্য এ অফিসটা যেন একটু ভদ্র হয়, সময়ের অতিরিক্ত না খাটায়, বেশী চেঁচামেচি না শুনতে হয়, এখানকার মানুষদের কিছু সৌজন্যবোধ থাকে। আমি তাকে অগ্নিশিখার সন্ধান দিতে না পারি কিন্তু তাকে সৌজন্য দিতে পারব। অগ্নিশিখার দহন সইবার শক্তি চাই, তাতে যে পুড়তে হয়। আর পুড়ছে অথচ ছাই হচ্ছে না এমন শক্তি কটা লোকের আছে? আমার সামনের লোকটার সে শক্তি আছে। কিন্তু আমার তা নেই। অথচ ভেবে দেখলে আমার দানই কম কি! মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতই হল সৌজন্যবোধ। আমি আবার মনোযোগ দিয়ে ফটোটার দিকে চাই। মেয়েটিকে আমার ভাবী বধূ হিসেবে কল্পনা করে নিতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। সে আমার নিস্তরঙ্গ জীবনে কোন আলোড়ন তুলবে না, কোন অনুযোগ না করে সেও স্বেচ্ছায় সে তরঙ্গে গা ভাসাবে।

হঠাৎ বাবার সান্নিধ্যে চমকে উঠলাম। বাবা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার হাত থেকে ফটোটা টেনে নিয়ে বললেন, "তুই কি শেষ পর্যন্ত একেই পছন্দ করলি?"

"হ্যাঁ,"

"কিন্তু কেন? এ ছবি তো আমি একেবারে শেষে রেখেছিলাম। এমন নিবে-যাওয়া চেহারা তুই বেছে নিলি? না না, এ তো নিবে যাওয়া না, এ তো কোনকালেই জ্বলে নি।"

"সেই জন্যেই তো বাছলাম।"

বাবা আমার খাটের কোণে ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, "তোকে এক দম বুঝতে পারি না আমি।"

"কেন আমি এ ছবিটা বাছলাম, এ তো জলের মতো সোজা।"

বাবা হেসে বললেন, "এত জলের মতো বলেই তো বুঝি না।"

"তুমি যখন বাছলে তখন তোমার একটা কারণ ছিল আর আমি যখন বাছলাম তখনও তার কারণ একটা আছে বৈকি !"

"হ্যাঁ, তা আছে কিন্তু সেটা কি ?"

"ত্যাখো, তোমার ঐ যে প্রথম মেয়ে, তার অনেক চাওয়া। ফটোতেই ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার ভয় হয়। ও এমনি একেবারে সাদাসিধে কিন্তু ওর চাওয়া আমি মেটাতে পারব না। পরের যে আদুরে মেয়েগুলো সাজিয়েছো তাদের বরং খুশি করা যায় যদিও কানের কাছে হয়ত ঘ্যান ঘ্যান করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওসব আদুরে মেয়েগুলোকে বিয়ে করে সুখ আছে। কিন্তু তোমার মেয়ে বাবা আমার কাছে অনেক চাইবে, সে আমার অস্তিত্বকেই মানবে না। সে একটা নিজের মনের মানুষ বসাবে আমার মধ্যে। আর যখন তাকে পাবে না খুঁজে তখন আমায় ক্ষমা করবে না। নিজেকে আমাকে দুজনকেই অভিশাপ দেবে। আর আমার যোগ্যতা নেই বাবা ও মেয়েকে ছোঁবার। তুমি কি বলে জেনেশুনে আমার পাশে ও মেয়েকে দাঁড় করাচ্ছো ?"

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও মেয়েকে আমি নিজে চিনি। কি চমৎকার মেয়ে তুই না দেখলে বিশ্বেস করবি না। এতটুকু মেয়ে কিন্তু কি তেজ। সঙ্গে সঙ্গে কি ফুর্তি। যেখানেই যায় মাতিয়ে তোলে, সব সময় টগ্‌বগ করে ফুটছে।

"ঐ জন্যেই তো আমি পছন্দ করি নি বাবা। ঠিক ঐ জন্যে। তুমি

সর্বদা ব্যক্তিত্ব খোঁজ। আমি কাছের মানুষের মধ্যে ভয় করি ব্যক্তিত্ব। দূরে থাকলে ওরকম লোকের জন্যে আমার মন কিছুটা পড়ে থাকে। কিন্তু আমার নিজের এই নিস্তরঙ্গ জীবনে কোন আলোড়ন চাই না। আমি তোমার মতো নই। তুমি আলোড়ন না-হলে বাঁচতে পার না। আর আমার কাছে ওগুলো ঝামেলা। আমি যা নই তা হতে যাব কেন? আমি যদি তোমার ও মেয়ের দিকে হাত বাড়াই তাহলে নিশ্চিত জানি আমার কপালে দুঃখ আছে। আমার ও সহ্য হবে না।''

"কিন্তু তুই কি বলে এই মেয়েটা বাছলি?"

"ঠিক যে কারণে তোমার মেয়েটাকে বাছি নি। এর সঙ্গে বিয়ে হলে তা আমার কাছে অভাবিত কোন ব্যাপার হবে না। এ মেয়ে যেমন আমাকে খুব একটা বড় সুখ দেবে না তেমনি দুঃখও ডেকে আনবে না। বেশ ঠাণ্ডা, শান্ত, ভদ্র হবে। আবার বাইরে কয়েক বছর চাকরি করার দরুন বাইরের জগতটার সম্বন্ধেও কিছু ধারণা থাকবে। ব্যস, আর কি চাই।"

বাবা তাঁর হাত দুটো শূন্যে তুলে বললেন, "বাঃ, এইটুকুনেই খুশি!"

আমি বললাম, "আবার কি, বেশী হলে যে সহ্য করতে পারব না। বেশী না হলে তুমি এক পা নড়তে পার না। আমার অবস্থায় তুমি একেবারে ঝাঁপ দিতে এই প্রথম মেয়েটিকে পাবার জন্যে। আমি ঝাঁপ দিতে গেলে ঘাড় মটকে পড়ব।''

"তুই কি সত্যিই এ মেয়েটাকে বিয়ে করার কথা ভাবছিস?" বাবা যেন শেষবারের মতো আমায় ধাক্কা দেবার চেষ্টা করলেন।

বিরক্ত হয়ে বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো বলছি। পাত্রী

দেখার ব্যবস্থা কর না। এই তো সামনের শুক্রবারই ব্যাঙ্ক হলিডে। ওদিনেই দেখার একটা ব্যবস্থা কর।"

বাবা চুপ করে বসে থাকেন। এতক্ষণ যেভাবে ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছিলেন তার ছেদ পড়ে। মুখের ভাবও বদলে যায়। আমার আবার হিংসে হয়। কি দারুণ ভঙ্গিমাভরা মুখ! আমার সঙ্গে কোন মিল নাই। এতক্ষণ যে মুখ ছিল কথায় উদ্ভাসিত সে মুখ এক গম্ভীর ভাস্কর্যের মতো দেখায়। চোখের পাতাও ফেলছেন না। হঠাৎ জেগে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "আচ্ছা তুই একটু বাইরে ঘুরে আয় না কেন। সেই কবে ম্যাট্রিক পাশ করে দেওঘর না মধুপুর গিয়েছিল, তারপর কলেজ থেকে বেরোলি, চাকরি করলি কবছর। একপাও নড়লি না।"

বাবার কথা সত্যিই মনে লাগার মতো। কয়েকবার বেরোবার কথা না ভেবেছি তা নয়। কিন্তু বাস্তবিক স্বভাবের এমন এক 'গেঁতোমি' আছে আমার মধ্যে যে শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয় নি।

বাবা বললেন, "কিরে, উত্তর দিচ্ছিস না যে। পাত্রী দেখা তো পালিয়ে যাচ্ছে না, যা না। কোথাও ঘুরে আয়। একটু হাওয়া লাগুক গায়ে।"

আমি বললাম, "কোথায় যাব? যেখানেই' যাব সেই চেঞ্জারের ভিড়…"

"দূর", বাবা আমায় থামিয়ে দিলেন। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "তুই যাবি?"

"হ্যাঁ, যদি লোকজনের ঝামেলা কম থাকে।"

"ঠিক আছে। আমার এক জানাশোনা হোটেল আছে সমুদ্রের ধারে।"

"পুরীতে বড্ড ভিড়।"

"না না, পুরী নয়। এ আরও ওদিকে, উড়িষ্যা ছাড়িয়ে, গঞ্জামে। সমুদ্রের ধারটাও নির্জন। হোটেলের ম্যানেজার আমার কাছে চিকিৎসা করেছে। এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা। বল, লিখে দি।"

একবার সোনার কথা মনে পড়ল। তার মায়ের চিঠিতে যে আর্জি ছিল তা মেটাবার কথাও মনে এল। বাইরে যাবার আগে একবার দেখা করব কি না ভাবছিলাম, তারপর জোর করে সমস্ত চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেললাম।

বাবা বললেন, "কি অত আকাশপাতাল ভাবছিস? অত ভাবলে কোথাও যাওয়া যায় না।"

উৎসাহিত হয়ে বললাম, "লিখে দাও,। সমুদ্রেই যাই।"

আট

বাঙ্কের ওপর মাথাটা এক শক্ত কাঠের তোরঙ্গে আর পা দুটো এক পেল্লাই পুঁটলির কোণে যে ফাঁক তার মধ্যে চালিয়ে দিয়েও তন্দ্রা এসেছিল। ট্রেন থামার আচমকা ধাক্কায় মাথা স্থানচ্যুত হওয়ায় তন্দ্রা কেটে গেল। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ছাতে মাথা ঠেকে যাবার সম্ভাবনা বিলক্ষণ। আমি আধশোওয়া অবস্থায় ক্রমাগত চেষ্টা করছিলাম ভাবতে যে পা বলে যে দুটো বস্তু নিয়ে সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এতক্ষণ দুমড়ে থাকার দরুন যা বড্ড টাটাচ্ছে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই কিংবা থাকলেও তারা আমার নয়। একবার ভাবলাম নিচে গিয়ে দাঁড়াব। কিন্তু কোথায়? বেঞ্চির পাশে পুঁটলির মতো লোক শুয়ে, দরজার কাছে দেহাতী লোকেরা দাঁড়িয়ে চলেছে, আর বাথরুমের সামনে মালের পাহাড়। কিছুক্ষণ আগে সেদিকে যাবার বাসনা হয়েছিল কিন্তু ঐ পাহাড়ের চেহারা দেখে অবধি আমি অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করছি।

তবু যে এভাবে একটা আসন করে নিয়েছি তাও বরাতের জোরে। তার জন্যে আমায় হিন্দী বলতে হয়েছে, ইংরেজীতে প্রায় একখানা বক্তৃতা দিতে হয়েছে। সেই হাওড়া স্টেশনে জানলা দিয়ে পা গলিয়ে কামরায় উঠবার সময় থেকে এই মাঝরাত্তির পর্যন্ত যা যা ঘটে গেল তাকে দুঃস্বপ্ন বললে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। এই হল ট্রেনে ভ্রমণ। রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর কোন প্লট ভেবেছিলেন ট্রেনের

কামরায়। কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম তিনি আমার মতো ট্রেনে চড়ে প্লট ভাবতে ভাবতে চলেছেন। আবার ঘুম এল, আবার স্থানচ্যুত হলাম। উঠে দেখি রাত্তির তিনটে। ঘণ্টাখানেক পরেই আমার গন্তব্যস্থল এসে যাবে।

নিচে নেমে চারপাশের ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে এক নজর তাকিয়েই মনে হল ভারতবর্ষকে যে লোকে একটা সমগ্র দেশ বলে তা একেবারে ভুয়ো, নেহাত রাজনৈতিক নেতাদের ধাপ্পা। বাংলা দেশের সঙ্গে অন্ধ্রের যা সম্পর্ক তা ফরাসী জার্মানীর সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশে নিবিড় নয়। ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে যতটুকু মিল বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে মিল ততটুকুই। একথা এড়িয়ে গিয়ে বলা হয় যে ভারতবর্ষের এমন এক ঐক্য যা অতীতকাল থেকে চলে আসছে। সেরকম ঐক্য ইউরোপেও আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে এই তথাকথিত যে মিল তা হল নেহাত মনুষ্যত্বের মিল। সে অর্থে সমস্ত পৃথিবীটাই একটা দেশ। কিন্তু দেশ বলতে যা বোঝায় সমস্ত ভারতবর্ষের মতো বিরাট এলাকা নিলে তার মানে থাকে কতটুকু? যেমন সামনের যে তেলেঙ্গী রমনী শুয়ে আছে তাকে স্বদেশবাসিনী ভাবতে আমার একটু কষ্ট হয়ই যেমন তার কষ্ট হয় আমাকে আপন ভাবতে। এরকম আপনার ভাব না হলে একদেশের লোক বলা যায় কেমন করে? এরকম আপনার ভাব ভারতবর্ষে এখনও জন্মায় নি, হয়ত জন্মাবে ভবিষ্যতে। এখন তা রাজনৈতিক নেতাদের জিভের ডগায় জন্মেছে মাত্র। নইলে মাদ্রাজী বাংলাদেশে গিয়ে কিংবা বাঙালী পাঞ্জাবে গিয়ে নিজেকে প্রবাসী ভাবে কেন? কেন ঠিক তার এই মনোভাব হয় যেরকম হয় কোন ইংরেজের ইতালীতে চাকরি করতে গেলে কিংবা কোন ফরাসীর অন্য কোন

ইউরোপীয় কর্মস্থলে? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ টের পেলাম অনেকক্ষণ চিন্তা করেছি। সীট্ না পাওয়ার দরুণ এত চিন্তাশীল হয়ে পড়লাম ভেবে একটু লজ্জা পেলাম।

গন্তব্যস্থল এসে গেল। সারারাত ট্রেনের কামরায়, ভিড়ে, দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচামেচিতে ক্লান্ত হয়ে প্রায় আধমরা বনে গিয়েছিলাম। ট্রেন থেকে নেমে ভোরের হাওয়ায় ভাল লাগল। এক কাপ চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিলাম।

বাসে ভাল সীট্ পেয়েছিলাম। ভোরের হাওয়ায় ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙল সমুদ্রের গর্জনে।

আগে জায়গাটা ছিল জেলেদের গাঁ। সাডিনের জাল ফেলে আর ফড়েদের কাছে সেই মাছ বিক্রি করে এখানকার 'মচ্ছি আদমী'দের সংসার চলত। কিছু ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক এখানে বসতি গেড়েছিলেন বছর পঞ্চাশেক আগে। এখন আবার অনেকে বাড়ি বিক্রি করে চলে যাচ্ছেন। সমুদ্রের ধারে কয়েকটা হোটেল, পুজোয় আর বড়দিনের ছুটিতে গমগম করে। নইলে খুব শান্ত নির্জন জায়গা অন্তত এখন তাই মনে হল। বাজার বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। দোকানে তেলেগু অক্ষরগুলো জানিয়ে দিল বিদেশে এসেছি। বাস্ সহরে ঢুকলেই কতকগুলো কুকুর চীৎকার করে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। হঠাৎ রাস্তা বাঁক নিতে বালি নজরে এল। একটা উঁচু বালিয়াড়ি বোধহয় সমুদ্রকে আড়াল করে রেখেছিল। রাস্তার দু পাশে বালির ওপর সারি সারি ঝুপড়ি, জেলেদের গাঁ। আমাদের গাড়ি ঢালু এক জায়গা দিয়ে নেমেই এক হোটেলের পাশে এসে দাঁড়াল। আমার অবশ্য হোটেলে জায়গা হয় নি, সীট্ পাই নি। এক স্থানীয়

বুড়ো ভদ্রলোকের বাড়ির একদিকে থাকার ব্যবস্থা আর হোটেল থেকে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

একে একে সবাই নামতে শুরু করেছে। আমি বসে আছি। হঠাৎ পিঠে হাত পড়তেই চমকে উঠলাম। একটা রোগা শুকনো চেহারার লোক আমার পিঠ থেকে হাত নামিয়ে সেলাম করল। তারপর একটু হেসে বললে, "মাই নেম স্যার তাঁতিয়া। আই চুইম্, মেক খানা, টেক মাল, টু রুপী।"

লোকটির পরনে নীল হাফপ্যাণ্ট, গোলাপী স্পোর্টস্ শার্ট। গলায় বাহারে সিল্কের মাফলার। কুচকুচে কালো চেহারা। কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে নইলে বয়স হয়েছে মালুম হয় না। লোকটার কথা আর চেহারার মধ্যে কোন অমিল নেই। তাঁতিয়াকে আমার ঠিকানা বলতেই কোন কথা না বলে আমার মাল তুলে নিয়ে আমাকে তার অনুসরণ করতে বলল।

অনেক দিন পর সমুদ্র দেখলাম। ছেলেবেলায় একবার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে পুরী গিয়েছিলাল। কিন্তু ঠিক এরকম লাগে নি সে সমুদ্র। সেখানে মন্দির দেখা, পূজো দেওয়া, সন্ধ্যেবেলা মায়েদের সঙ্গে দোকানপাটে যাওয়া, তাছাড়া নানা আশ্রম মঠে যাবার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার অস্তিত্ব। তার নিজস্ব বিরাট ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচয় হয় নি। এখানে এসে আবিষ্কার করলাম সমুদ্র তার অসংখ্য ঢেউয়ের গুঞ্জন, তার অজস্র রঙের খেলা তার অগণিত জীবজন্তু উদ্ভিদ, এমন কি তার তীরে জেলেদের নৌকা, ঝিনুক, কাঁকড়া, এক কোণে ব্যাকওয়াটারের জল আর ঝাউবন এই সব নিয়ে একটা বিপুল শক্তিমান পুরুষ। আর সেই লোকটা তার দেমাকের ঠমকে আমায়

অস্থির করে তুলল। আমায় সে ডেকে বললে, "তুই একটা পোকা।" আর তা এমন গম্ভীর একটানা ঘোষণার মতো বলে চলল যে আমার সহ্য হচ্ছিল না। সমুদ্রের ধারে কেন লোকে আশ্রম করে ভেবে অবাক লাগল। আশ্রমের স্থান পাহাড়ে যা নিশ্চল, যার কোন ভাষা নেই এমন কি যার মৌন নিজের স্থবিধে মতো ব্যাখ্যা করে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ গর্জনের তো একটা মাত্রই ব্যাখ্যা— এক অমানুষিক অস্তিত্বের গৌরব। সে গৌরব এত আকাশচুম্বী এত সৌরজগতস্পর্শী যে তাকে আপনার ভাবতে কষ্ট হয়। যদি এই বিরাট গুঞ্জনের পাশে সবচেয়ে ভাল গান বাজাই তাহলে কি মাঠে মারা যাবে না সে গান? কিম্বা যদি কথা বলি যেমন ভাবে মানুষ কথা বলে—অনুরাগের কথা কিংবা ঔদাসিন্যের কথা—তারও কি কোন মানে হয় এখানে? এই কালহীন গুঞ্জনের পাশে একান্ত বিতৃষ্ণা এবং একান্ত সোহাগের ভাষা যে একই পর্যায়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ কোন ভাষারই কোন মানে থাকে না। আমার মনে হল সমুদ্র একটা অন্ধ দাবী করছে মানুষের কাছে, যে দাবীর কোন যুক্তি নেই, বিচারবোধ নেই। ঠিক যে ভাবে গীতার একেবারে শেষে ভগবান কৃষ্ণ দাবী করছেন যে সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁকেই স্মরণ করতে হবে তেমনি ভাবে ঠিক তেমনি অসঙ্কোচে সব রকম লজ্জার মাথা খেয়ে এক হিংস্র অহঙ্কারে সমুদ্র তার দাবী জানাচ্ছে—আমাকে দেখো, আমাকে বোঝ। আমার অস্তিত্বের সঙ্গে তোমার অস্তিত্ব মিলিয়ে দাও।

তাঁতিয়ার গলার আওয়াজে আমার চমক ভাঙল। সে আমার মাল-পত্র নামিয়েছে। জানাতে এসেছে আমার চা জলখাবার রেডি। তার কড়া-পড়া শক্ত কাঠের মতো হাতখানা আমার হাতের সঙ্গে ঘষে দিয়ে বললে, "মচ্ছি আদমী, ইয়ং ম্যান, টেক বোট। ক্যাচ্ ফিশ ডেলি।"

"এখন মাছ ধরতে বেরোও না?"

"আভি বুড্ডা, আভি গোসল দেতা হ্যায়। মেমসাব সাব, টু টাইম গোসল। চুইম। একলা মাৎ যানা। নয়া আদমী, পানি খিঁচ লেগা। টু টাইম যাও, এ্যায়সা মোটা হোগা।"

তাঁতিয়া তার টিং-টিংয়ে পেট ফুলিয়ে একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গী করল। যুদ্ধের সময় প্রচুর ইংরেজ আমেরিকানদের আগমনে এরা ক্রিয়াপদশূন্য ইংরাজীটা রপ্ত করেছে, আর রপ্ত করেছে আমাদের বাঙালীদের মতো হিন্দী। কাছ থেকে লক্ষ্য করলাম তাঁতিয়ার চোখ দুটো ছোট হলেও খুব তীক্ষ্ণ। গালের পাশে অসংখ্য খাঁজ। তাঁতিয়াকে বললাম যে তার এত গোসল করা চেহারা দেখেও বিশেষ ভরসা পাচ্ছি না। সে আমার কথা শুনে তার একগুচ্ছি চুলওয়ালা পাখির মতো ছোট্ট মাথাটা নাড়ল। তারপর মুখ থেকে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ বার করে এতক্ষণ পর একটা সম্পূর্ণ হিন্দী বাক্য বললে, "সাব লোক চলা গিয়া ইস্ লিয়ে দুব্‌লা হো গিয়া।"

তার দিকে অবাক হয়ে তাকাতে সে আমায় বোঝায় যে সাহেবরা থাকার সময় সে দু সের করে চাল খেত রোজ। কিন্তু এখন চালের দর বেড়ে যাওয়ায় তারা পরিবারের সবাই মিলে দু সের চাল খেয়েও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তার দ্বিতীয় কথা আরও তাজ্জব লাগে। আমার কাছে এগিয়ে এসে গলা খাটো করে সে জিজ্ঞেস করল আবার কোন যুদ্ধটুদ্ধ বাধবে কিনা। বললাম, "কাদের সঙ্গে?"

"হিন্দুলোক কো সাথ সাব লোক কো। ইয়ে হোনে নেহি সাকতা? হিন্দুলোককো ফিন ভাগা দেতা সাব লোক, হোনে নেহি সাকতা?"

"তুমি হিন্দুলোক নও ?"

আমার প্রশ্নে তাকে একটুক্ষণের জন্যে বিহ্বল দেখায়। তারপর যে একগুছি চুল অবশিষ্ট আছে সামনের দিকে তাই কপাল থেকে সরিয়ে ধীরভাবে বললে, "হাম গরীব আদমী।"

তখনও তার কথা ঠিক বুঝতে পারি নি। চা খেতে খেতে যখন সে খুব অসংলগ্নভাবে তার কাহিনী বলতে শুরু করল তখন সব মিশিয়ে একটা ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। সে ছবি খুব চেনা, দারিদ্র্য আর অনাহারের সঙ্গে আজীবন সংগ্রামের ছবি। সার্ডিনের জাল যখন ফেলা হয় আর ভাগ্য প্রসন্ন হয় যেবার সেবার ভাত আসে ঘরে, বৌ ছেলেরা জামা কাপড় পরতে পায়। আর যুদ্ধের সময় ইংরেজ আমেরিকান সাহেবরা এসে এখানে নোটের তাড়া ছড়িয়েছে। সেই সময়টা এখানকার লোকে খেয়ে পরে বেঁচেছিল।

বছরে প্রায় ছ মাস খাওয়ার অনিশ্চিতি থেকে বাঁচার জন্যে তাঁতিয়া জোয়ান বয়েসে গিয়েছিল চা বাগানে কিন্তু সেখানেও আধপেটা থাকতে হত। সেখানে থেকে কাঠের কারবারীদের সঙ্গে মিশে সে চলে যায় ব্রহ্মদেশে। ব্রহ্মে জনৈক চীনে পরিবারের সঙ্গে খুব খাতির জমে। তাদের মাঝখানেই সে থেকে যায় পাঁচ ছ বছর। এমন কি সে বাড়ির ছোট মেয়ে তাকে সাদি করতে আহ্বান জানায়, সাদি করে তাকে চীনে নিয়ে যাবে বলে। তাঁতিয়া সেখানে যে চীনে আর বর্মী ভাষা শিখে ফেলেছিল সে বিষয় আমায় নিশ্চিন্ত করার জন্যে মাঝে মাঝে তার কথার মধ্যে কতগুলো অনুস্বারযুক্ত শব্দ অযথা প্রয়োগ করছিল। মেয়েটাকে সে কথাও দিয়েছিল। তারপর রাত্তিরে বুড়ো বাপের কথা মনে পড়ত। আর সবচেয়ে বেশী মনে পড়ত এই জলের চীৎকার যা ছেলেবেলা থেকে তার ঝুপড়ির ভেতর শুয়ে শুয়ে শুনেছে।

স চীৎকার শোনবার জন্যে তার মন কেমন কবত। এক রাত্তিরে সেই মেয়েটিকে না জানিয়েই সে আবার ফিরে আসে তার বাপপিতামহের অনিশ্চিত জীবনের ভিটে-মাটিতে। তার কাহিনীর শেষে সে আমায় জানাল যে আমি যেন তাকে একদিন খাওয়াই। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না বলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে যেন ভাত-দেওয়া বারণ না করি। এরকম খাওয়া সে ছেলেবেলায় আর চীনে পরিবারের সঙ্গে থাকতে খেয়েছে। পরে আর খায় নি।

তাঁতিয়া হঠাৎ বাইরেব দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "চলিয়ে সাব, ন বাজ গিয়া।"

গায়ে তেল মাখতে মাখতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঝলমল করছে রোদ চারদিকে। আর সেই রোদে নীল সমুদ্রের বুক উঠছে পড়ছে। কতকগুলো জেলেদের নৌকো ফিরে আসছে। কালো কুচকুচে কয়েকটা ছেলে ডিগবাজি খাচ্ছে বালিতে।

চানের জাঙিয়া পরে তাঁতিয়া বেরিয়ে এল। তারপর তার সড়িঙ্গে হাত দুটো সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হুকুম করল, "গো, চুইম।"

সেই ঝলমলে আলোর নিচে বালি আর নীল জল আমায় চেঁচিয়ে ডেকে উঠল। আমার ইচ্ছে হল এখনই ডিগবাজি খাই বালির ওপর ঐ ছেলেগুলোর সঙ্গে। তেলমাখা শেষ না করেই আমি তোয়ালে কাঁধে ফেলে সমুদ্রের দিকে দৌড়লাম। এক প্রবল উত্তেজনায় আমার শরীর মন চনমন করছিল।

জলটা একটু গরম। নামতেই বড় আরাম দিল। আমরা কাত হয়ে এগোতে লাগলাম। প্রথম সার ঢেউ ফেনায় ভরে দিল আমার কোমর বুক। তারপর আরও এগিয়ে গেলাম। তাঁতিয়ার

হাঁক কানে বাজল, "লাফা করকে ঝাঁপা-আ"। প্রথম ঢেউটা আমায় ঠিক দোলনার মতো শূন্যে তুলিয়ে নামিয়ে দিতেই তাকিয়ে দেখলাম এক চলন্ত ঢেউয়ের পাচিল ঠিক ভাঙ্গছে আমার ঘাড়ের ওপরেই। আমি মাথা নিচু করলাম। আমার ওপর দিয়ে অজস্র মত্ত হাতি নেচে কুঁদে বেরিয়ে গেল।

চান করে উঠে দেখলাম সারারাত বেকায়দায় শোওয়ার দরুন যে ব্যথা হয়েছিল তা একেবারে অনুপস্থিত। সমস্ত শরীর চাঙ্গা, ঝরঝরে। ঘরে বসে থাকতে পারলাম না এমন কি তাঁতিয়া যে বারান্দায় একটা ক্যাম্প চেয়ার পেতে দিয়েছিল সেখানেও বসে থাকতে পারলাম না। তাঁতিয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিল। আমিও তার পিছু ধরলাম। ঢেউয়ের দোলাটা আমার রক্তে নাচছে তখনও। মনে হচ্ছিল কোথাও যদি খুব সোরগোল হয়, অনেক লোক ঘোরে ফেরে, হৈহল্লা করে সেখানে থাকতে আমার খুব ভাল লাগবে। বই নিয়ে বসবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছু হল না। এমন এক উষ্ণতা আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে নামল যে বইয়েও মনোযোগ এল না।

বাজারে কফিখানায় কফি খেলাম। কতগুলো সাদা হাফপ্যাণ্ট পরা মেমসাহেব মাথায় বেতের টুপি চড়িয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় মেয়েদের ভিড়ই বেশী, তরকারির ডালা সাজিয়ে বসেছে তারা। তরকারির মধ্যে ঝুনো নারকেল আর চিচিঙ্গে প্রচুর। কিছুক্ষণ ঘুরে চা চিনি সিগারেট কিনে ফিরলাম। চায়ের ব্যবস্থার জন্যে ঠিক করলাম হোটেলের হাততোলা হয়ে থাকব না।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বারান্দায় ক্যাম্পচেয়ারে এসে বসলাম। উত্তাল হাওয়া। কাগজ বই উড়ে যাচ্ছে। বাইরে প্রচণ্ড

আলো, চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এমন নীল আকাশ আর সমুদ্র। আর হলদে তামাটে বালিও জ্বলছে সে আলোয় একেবারে নতুন পিতল কাঁসার বাসনের মতো। কিন্তু সে আলোর এক তীব্র মাদকতা আছে। চোখ মন এ আলোয় প্রথমটা ব্যথা পেলেও তারপর যেন পান করে। আর এক সর্বক্ষণ উপস্থিতির মতো সমুদ্রের অবিশ্রান্ত স্বর। সেই স্বর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে আর ঢেউয়ের মতো হাওয়ায় উঠছে পড়ছে ভাঙছে আছ্‌ড়াচ্ছে। আমি বুঁদ হয়ে সেই আলো হাওয়া আর অবিশ্রান্ত সমুদ্রের আওয়াজের মাঝখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে সেই একটানা গম্ভীর আওয়াজ কানে এসে বাজছিল।

তাঁতিয়া চা করে আনল বিকেলে। একলা চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠি। সামনে এক মূর্তি দাঁড়িয়ে যার উপস্থিতি আমি কল্পনাও করি নি কখনও। মূর্তিই বটে! এক বুড়ি, পরনে ডোরাকাটা পাজামা, শরীরের ওপর দিকে কতগুলো রঙিন কাপড়ের টুকরো জড়ানো। খুব ঢ্যাঙা, শুকনো চেহারা। এক মাথা সাদা বাহারে চুল, বেশ ঠাসা, থাকে থাকে নেমেছে পিঠ পর্যন্ত। আর চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। ডাইনী বলতে কল্পনায় যে ছবি ভেসে ওঠে বুড়ির চেহারা অনেকটা সেরকম। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

লক্ষ্য কয়লাম বুড়ির হাতে একটা লাঠি, সেটা তার চেয়েও লম্বা, আর এক হাতে দালদার খালি টিন। পেছনে বাদামী রংয়ের রাস্তার দুটো কুকুর।

বুড়ি তার দালদার টিনটা আমার সামনে তুলে ধরে বললে, "টি পানি দেগা, টি পানি?"

বললাম, "চা আর নেই। কাল সকালে এসো।"

বুড়ি তার ডাইনীর চোখ দিয়ে আমায় ভাল করে দেখে হাসতে শুরু করল। দেখলাম চমৎকার দাঁতের পাতি, একটাও বাঁকে নি ভাঙে নি। "টি নেহি, টি নেহি, টি-কা পানি। তুম বাঙালী?"

হিন্দীতে বললাম যে বাঙালী হলেও আমার চা ফুরিয়ে গেছে।

বুড়ি কর্ণপাত করল না। উঠে এসে বারান্দার সিঁড়ির এক ধাপে লাঠি রেখে জুত করে বসল। কুকুর দুটোকে শান্ত করল কিছুক্ষণ ধমকিয়ে। তারপর বললে, "কেটলিমে চা কা পাত্তি আছে না? উসমে গরম পানি দেও। হাম বাঙালী বাৎ ভি বলতা হ্যায়।"

তার কথামতো যে গরম জলটুকু ছিল তাই কেটলিতে ঢেলে দিলাম। কয়েক মিনিট পর সেই টি পানি দিলাম দালদার টিনে। তাঁতিয়া বাজার থেকে কমলা আর মোসাম্বী এনে বারান্দার টেবিলে রেখেছিল। সেদিকে নজর পড়তেই বুড়ি বললে, "কমলা কা চামড়া হ্যায়?"

তার আবদারে একটু বিরক্তই হলাম। বুড়ি আমার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললে, "কমলা নেহি, কমলা কা চামড়া। উধার মে হ্যায় দেখো।" টেবিলের এক কোণে বিকেলে যে দুটো কমলা খেয়ে খোসা ফেলে রেখেছিলাম সেই খোসা নিজেই নিয়ে এল। তারপর তার দালদার টিন থেকে এক চুমুক টি পানি খেতে লাগল আর মাঝে মাঝে কমলা লেবুর খোসা মুখে পুরতে লাগল। তাকে আমি কমলা এনে দিলাম। সে নিল না।

বুড়ির খাওয়া দেখে মনে হল সে কোন চমৎকার মাংসের রোস্ট কিংবা সুগন্ধী বিরিয়ানি খাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে কমলালেবুর খোসা পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোচ্ছে আর টি পানি খাচ্ছে। মাঝখানে

বিড়বিড় করে সে যা বললে তা থেকে জানা গেল যে সে কমলা খায় না কারণ কমলা তার মোটেই ভাল লাগে না। ভাতের জন্যে সে কাউকে জ্বালাতন করে না, পয়সা চায় না, সে রোজ হোটেলগুলোতে গিয়ে দাঁড়ায় আর তারা ভাতের ফ্যান তার দালদার টিনে ঢেলে দেয়। এক টিন তার কুকুরের জন্যে আর দু টিন তার নিজের। ফলের মধ্যে কমলা আর কলার খোসা তার প্রিয় খাদ্য। খাওয়ার পর সে তার কুকুর দুটোকে ডাকল। তারা তার টিনে মুখ ঢুকিয়ে বাকী টী পানিটুকুর সদ্ব্যবহার করল। বুড়ি যখন তৃপ্তির সঙ্গে তার কাপড়ে মুখ মুছতে মুছতে আমায় বললে যে আমি যেন আগামীকাল টি পানি রাখি তখন বিহ্বলভাবে মাথা নাড়ালাম। সন্ধ্যের অন্ধকারে কুকুর-গুলোকে ডাকতে ডাকতে বুড়ি মিলিয়ে গেল।

নয়

ভোর না হতেই আমার বাসার পিছনে ভেনুগোপালের মন্দিরে নহবত বাজে। প্রথম প্রথম অসোয়াস্তি হত। কারণ যন্ত্রটি সানাই নয় আর গিটকিরিপ্রধান কর্ণাটীয় সঙ্গীতে কান অভ্যস্ত নয় আমার। কিন্তু দু তিন দিন যাবার পরই সকাল হলে আমি অপেক্ষা করতাম মন্দিরে কখন নহবত বাজবে। আর সেই বাজনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের পুরুষ্ট চেহারার পুরোহিত তার এক পাল ছেলে পিলে নিয়ে বেরোবে বাজারে। তার স্থুলাঙ্গিনী স্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকবে চৌকাঠ ধরে। সে বাজনা মাঝামাঝি যেতে না যেতে ব্যাক-ওয়াটারের উল্টোদিকে যে বেঁটে বেঁটে ঝাউয়ের বন তার গায়ে সূর্যের আলো এসে পড়বে। তারপর বালির ওপর খেলা শুরু হবে কুকুরে ছেলেতে। সমুদ্রের নুনে ক্ষয়ে যাওয়া জেলেদের নৌকোগুলো কাঁধে করে নামানো হবে। আর একটু পরেই যেখানে বালির ঢিপির নিচে বাঁশের ডগায় লাল শালু উড়ছে একটা, নোড়া পোঁতা আছে বালিতে সেখানে কালো কালো হাত সমুদ্রের দিকে প্রণাম জানাবে। পারের ঢেউয়ে নৌকোগুলো ওলটপালট খাবে, তারপর যেখানে আকাশের নিচে নীল জল স্থির হয়ে আছে, যেখানে আর চোখ যায় না সেখানে এক একটা করে নৌকো মিলিয়ে যেতে থাকবে। আর মন্দিরের সামনে বাদাম গাছের তলায় যে কুয়োটা সেখানে মেয়েরা আসবে জল নিতে। তারপর তারাও নৌকোর মতো হেলে দুলে মিলিয়ে যাবে রাস্তার বাঁকে। তাদের মাথায়

পিতলের ঘড়া সকালের রোদ্দুরে ঝকমক করবে রাস্তার বাঁক পর্যন্ত। তখন তাঁতিয়ার হাঁক কানে আসবে, "টি রেডি সাব।"

এক সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে অবাক হলাম। মুখের রং সামান্য পালটেছে। নাকের পাশ দিয়ে তামাটে লাল ছোপ গালের দু দিকে নামতে শুরু করেছে। দু বেলা সমুদ্রে দাপাদাপিতে গালের মাংসও যা সম্প্রতি চাপ বাঁধছে তাও একটু ঝরেছে মনে হল। নিজের মনকেই হয়ত সান্ত্বনা দিলাম কিন্তু বাস্তবিক অনেক হালকা লাগছিল শরীর। অফিস থেকে ফেরার পর সেই গা-ভরা অবসাদ যেন অন্য মানুষের। সে মানুষের সঙ্গে এই আলো আর হাওয়ার জগতের কোন যোগ নেই।

সেদিন সমুদ্রের ধারে ছেলেদের হল্লা শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। এক অদ্ভুত জীব সমুদ্রের পারে এসে ঠেকেছে। পাঁচ ছ হাত লম্বা আর তিন চার হাত চওড়া থলথলে কালো একটা জন্তু। তার মুখ চোখ কোনদিকে বুঝতেই খানিক সময় গেল। নুলিয়ারা বললে ওটা মরে গিয়েছিল কাছাকাছি কোথাও, ভেসে এসেছে। নাম যা বললে তাতে কোন সুবিধে হল না। আমি সেই অতিকায় মাংসের তালের কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। মন থেকে সরাতে পারছিলাম না সে বিশ্রী ছবি। হঠাৎ একটা লোক আমার পাশে এসে সেলাম ঠুকল। সাঁতারের জাঙ্গিয়া, মাথায় টুপি, ঠিক নুলিয়ার চেহারা। তবে চেহারায় নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল, একেবারে কুচকুচে কালো মুখের মধ্যে বলেই বোধ হয় তার দীপ্তি চোখে লাগে। বয়স কুড়ি বাইশের বেশী নয়। মাঝারি চেহারা। পিঠ আর ঘাড় খুব চওড়া, নিচের দিক হাল্কা। তার চেহারার গড়ন দেখে ভুলে গেলাম সেই বিশ্রী জন্তুটার ছবি। ছেলেটি চমৎকার

হাসল। সুন্দর এক পাটি দাঁত তার ঝকঝকে ব্যক্তিত্বকে আরও প্রকাশ করল। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে বললে, "হাম্ নীলা, তাঁতিয়াকা ভাতিজা। সাব লোক রেস কিয়া। হাম ফাস্ট। তাঁতিয়া বুড্ডা হ্যায়। হাম্ জোয়ান, আচ্ছা গোসল দেগা, টু রুপী।" সে যেন বিদ্রূপ করেই আবার সেলাম ঠুকল।

এদের সেলামের বহর যে কতদূর হাস্যকর হতে পারে তার পরিচয় পেয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। দুপুর পড়ে এলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসেছি। এক নুলিয়া এসে আমার পাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল। যত বলি আজ বিকেলে জলে নামব না, ঠাণ্ডা লাগছে, শরীর খারাপ ইত্যাদি সে নাছোড়বান্দা। শেষে আমায় তাক লাগিয়ে সে তার ভাঙা হিন্দীতে বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করল—"সমুন্দর কেয়া সুন্দর। কেয়া আচ্ছা পানি। কিতনা লম্বা।" তারপর আর চালাতে-না পেরে আবার সেলাম ঠুকে বললে, "চার পয়সা।" তার দিকে অবাক হয়ে চাইতেই সে আশ্বাস দিল, "চার পয়সা, যাস্তি নেহি।" যখন তাকে ভাগিয়ে দিলাম তখন সে এমন ক্ষুন্নভাব দেখাল যেন আমি তাকে তার পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করেছি। নীলার ঘন ঘন সেলামে তাই একটু বিরক্তই হলাম।

পরদিন ভোরে দেখি তাঁতিয়ার বদলে নীলাই চা নিয়ে এসেছে। তাঁতিয়া অসুস্থ হয়েছে কিংবা বেসামাল। অন্তত নীলার হাসি তাই বোঝাল। সেদিন সকালে নীলার সঙ্গে যে আলাপ হয়েছিল তা অনেকদিন মনে পড়েছে। ভাঙা হিন্দী আর হাত পা নাড়ানোর মারফত সে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল নিঃসঙ্কোচে। আমাদের আলাপ বাংলায় ফেললে দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম।

"তুই কি নীলা তোর কাকার মতো গোসল দিতে পারবি? তুই তো একেবারে ছোঁড়া আর তাঁতিয়া…"

"তাঁতিয়া তো বিলকুল বুড়ো হয়ে গেছে। কদিন আর বাঁচবে। গত বছরই টেঁসে যেত। খুব বেঁচে গেছে। আমাদের বুড়োরা বাঁচে না। যারা সমুদ্রে জাল ফেলতে পারে না, মচ্ছির কাম করতে পারে না, গোসল দিতে হাত পা কাঁপে তারা বাঁচবে কি করে বল? তুমি সামনের বছরেই এসে দেখো। ব্যাটা দোরে দোরে ভিখ মাগছে। ওরকম কতো বুড়ো আছে এখানে।"

নীলার কথাবার্তায় এমন এক দ্বিধাহীন হৃদয়হীনতা যে সে সহজেই অভিভূত করে ফেলল আমায়। বললাম, "তুইও তো বুড়ো হবি ব্যাটা। তোর কাকা হয়েছে আর তুই কি খোকা থাকবি চিরকাল?"

সমস্ত মুখ নীলা হাসিতে ভরিয়ে ফেলল। মাথার চুলগুলো খুব কায়দায় ঝাঁকাল। একবার নিজেই কাত হয়ে তার নগ্ন কাঁধের দিকে তাকিয়ে গর্বের সঙ্গে বললে, "কেমন খাপসুরৎ না আমি?" তারপর হঠাৎ আমার দিকে তার উজ্জ্বল চোখ তুলে বললে, "তুমি সাদি করেছ?"

আমি যখন না বললাম তখন সে একবার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললে, "তোমার ছুকরী লাগবে?"

সঙ্গে সঙ্গেই বললে আসলে আমি এ লাইনের লোক কিনা সে জানতে চাইছে। এ লাইনের অনেক লোক আসে এখানে তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। সাহেবরা তো এ বিষয়ে ওস্তাদ। তাদের আসার আগেই সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে থাকে আর আমি একলা মানুষ ইত্যাদি।

অন্য সময় কি ভাবতাম জানি না। কিন্তু এখন নীলার কথা আমায় খুব অবাক করল না বরং তার স্পষ্ট কথাবার্তা ভাল লাগল। বললাম, "তুই সাদি করেছিস?"

"এই বছরেই হবে। সেইজন্যেই তো ছুকরীদের ছাড়তে হচ্ছে। ঐ যে বাদামতলা, ওর নিচে রোজ সকালে একটা ছোটখাটো ছুকরী আসে না—ওর সঙ্গে আমার ভাব। ওর সাদি হয়ে গেছে।"

এবার সে ছোট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "দেখেছ ছুকরীটাকে, তোমার পছন্দ হয়?"

একটা বেয়াড়া আনন্দে তার চোখ ঝকঝক করে। আমার হঠাৎ রমেনের কথা মনে পড়ল। সে ঠিক এই ভাবে মিনুকে দেখিয়ে বলেছিল, "কি, মনে ধরে?"

"তোর বাপ কি মচ্ছির কাম করে?"

"বাবা মারা গেছে। বুড়ো হয়ে রাস্তায় ভিখ মাগত। একদিন পড়ে মারা গেল। দাদাই আমায় মানুষ করেছে। তার একদিন কলেরা হল। আমাদের এই কাকা তাঁতিয়া পালিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। মা-ও চলে গেল সহরে তার এক বোনের কাছে আমার মেসো লরি চালায় সেখানে।

"তোর দাদার কলেরা হল, তারপর?"

"মরে গেল।" (হিন্দীতে বলেছিল, ফাঁস গিয়া, আউর কেয়া?)

তারপর সে ছেলেবেলার গল্প করে। পাড়ায় যাদের সঙ্গে বাস করত তাদের সাথে একদিন চান করতে যায়। অনেক দূর এগিয়েছে এমন সময় তাদের দুজন দুদিক থেকে এসে গলা টিপে ধরল তার। আগেই তারা সাঁট করেছিল তাকে মারবার জন্যে। সে অবস্থায় সে 'পানিকা শের-' এর মতো তাদের হারিয়ে জল থেকে উঠেছে।

আরও গল্প করল সে। সমুদ্রে নেমে কেমন নাস্তানাবুদ হয়েছে নতুন লোক, কেউ কেউ প্রাণ হারিয়েছে। এমন এক তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললে যেন ঠিকই হয়েছে তাদের প্রাণ গিয়ে। তাঁতিয়ার কাছেও শুনেছি এ রকম ঘটনা। যারা মচ্ছি আদমীদের সঙ্গে না গিয়ে বড়াই করে জলে নেমে বিপদে পড়েছে তাদের সম্বন্ধে দুজনেরই তাচ্ছিল্য। মাসখানেক আগেই এরকম ঘটনা ঘটে গেছে এখানে। উত্তর ভারতের নামজাদা এক ব্যবসায়ীর ছেলে প্রাণ হারিয়েছে। জোয়ারে পড়ে আর সে ফিরে আসতে পারে নি। লোকটি সাঁতার জানত ভালই নুলিয়াদের নিষেধ না শুনে একলা ভেতরে চলে গিয়েছিল। সে গল্প বলার সময় হাসতে হাসতে নীলার চোখে জল এল, পেটে খিল ধরে গেল। হাত পা শূন্যে তুলে উদ্ভট ভঙ্গীতে বললে, "মর যাতা হ্যায়, মর যাতা হ্যায়। আরে শালা আচ্ছাসে মর। আউর পানি পি লেও। বহুৎ পানি হ্যায় সমুন্দর মে।"

সমুদ্র এদের সবাইকে রাজা বানিয়েছে। আমরা যারা বিদেশী, সমুদ্রের সঙ্গে কোন কারবার নেই, যাদের জীবনে এরকম অনিশ্চিতি নেই, নেই অহরহ যুদ্ধ, যাদের চোখের সামনে ভয়ানক এক উপস্থিতি শব্দে গন্ধে আলোড়নে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে না তারা সবাই এখানে এলে তাঁতিয়া আর নীলাদের প্রজা। যদি বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া না হয় তাহলে বিপদ স্বাভাবিক। আর এই অর্ধভুক্ত রাজারা তাদের শক্তির বড়াই করবে না কেন? একবার তাঁতিয়াও কোন এক ধনী আমেরিকানকে বলেছিল, "তোমার ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে সাহেব—এক লাখ, দশ লাখ, বিশ লাখ? আর আমার ব্যাঙ্ক দেখেছ?" বলে সামনের বিশাল নীল জল দেখিয়ে বলেছিল, "কত কোটি টাকা এখানে আছে জানো? ফি বছর সার্ডিনের জাল দিয়ে এ ব্যাঙ্ক থেকে

আমরা টাকা তুলি।" সমুদ্রের সান্নিধ্যে সমাজব্যবস্থার যে শ্রেণীবিচার তার মাপকাঠিও এখানে অচল। কারো ব্যাঙ্কে অনেক টাকা থাকতে পারে, কলকাতায় বাড়ি থাকতে পারে অনেকগুলো, বিদেশী কোন শাঁসাল কোম্পানির পার্টনার হতে পারে কেউ কিন্তু সকলেই তাঁতিয়া আর নীলার প্রজা।

হঠাৎ তার হাসি থামিয়ে নীলা প্রশ্ন করল, "তোমার কত সোনা আছে?"

"সোনা!"

"আমার যে বৌ হবে সে আমায় এ্যাত্তো সোনা দেবে," নীলা তার দুটো হাত মুঠো করে দেখালো সোনার পরিমাণ। তারপর মুখখানা গম্ভীর করে বললে, "আমি খুব বড়লোক হব, না?"

তার কথাবার্তায় জানালাম তার ভাবী বৌএর সামান্য জোতজমির মালিক হবেই সে, দু বেলা খেতে পাবে নিশ্চিন্তে, দোরে দোরে গিয়ে গোসল দেবার জন্যে সেলাম ঠুকতে হবে না। বলবার সময় তার চোখ আরও উজ্জল দেখাচ্ছিল।

সেদিন জলে নামলাম নীলার সঙ্গেই। বুঝলাম তাঁতিয়া একটু বড় রকমের বেসামাল হয়েছে। মাসে একবার করে সে নাকি এরকম হয়। এক সঙ্গে কিছু টাকা দিয়েছিলাম দিন দুই আগে, তার সদ্ব্যবহার করেছে ভালভাবেই। নীলার মত সাঁতারু খব কম দেখেছি। তার দম আর বেগ দুটোই আশ্চর্য রকমের জোরালো। রেসে নাম দিলে নামজাদা সাঁতারু হতে পারত। জলের মধ্যে নানারকম কারসাজি দেখাতে সে আমায় জানিয়ে দিল যে সমস্ত নুলিয়াদের মধ্যে সে তিনবার পর পর ফাস্ট হয়েছে সাঁতারে। বড় বড় ব্রেকারের মাথায় চড়ে তীরের মতো বেগে ডাঙায় এসে

পৌঁছোনর যে কায়দাটা সে নিপুণভাবে দেখাল বারবার তা সত্যিই তাক লাগাবার মতো। তবে মুস্কিল হচ্ছিল। তাঁতিয়া আমার সঙ্গ ছাড়ে না জলে নেমে। কিন্তু নীলা তার নিজের কলাকৌশল নিয়েই এত মত্ত যে মাঝে মাঝে একটু বেকায়দায় পড়ছিলাম। একবার বিশাল বিশাল তিনটে ঢেউ পরপর এল। ডবল ব্রেকার কখনও আসে কিন্তু সেবার তিনটে এল পরপর। আমি দুটোকে সামলে কোন্ রকমে মাথা তুলেই দেখি আচমকা এক বিশাল ঢেউ গর্জন করে ভাঙছে আমার ঘাড়ের ওপর। তখনি ডুব দিলাম। কিন্তু সামান্য দেরি হয়েছিল। মুহূর্তের জন্যে মনে হল ক্যাম্বিসের বলের মতো আমায় কেউ সজোরে পেটাচ্ছে বালির ওপর। অনেকখানি জল খেয়ে হাফসে ওপরে উঠতেই নীলা চীৎকার করে হেসে হাততালি দিয়ে আমায় সম্বর্ধনা জানাল। তাকে আমি ধমকালাম, কিন্তু সে হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। আর সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকে জানিয়ে দিল সে নাকি প্রচণ্ড হাঁক দিয়েছিল কিন্তু তখন দ্বিতীয়টা সামলাতেই আমি এত ব্যস্ত যে সে ডাক আমার কানে পৌঁছয় নি। আত্মসম্মানে লাগল আমার। সামানে গিয়ে আরও কয়েকটা বড় বড় ঢেউ খেলাম। নীলা এবার হাততালি দিয়ে তারিফ করল।

সেদিন জল থেকে উঠে নীলা বললে, পরদিন পূর্ণিমা, সেদিন সন্ধ্যেবেলা চাঁদ উঠলে আমাকে নিয়ে জলে নামবে। আমার একটু ভয় হল। বললাম, “পূর্ণিমার সময় জোয়ার আসবে, তাঁতিয়া বারণ করেছে জোয়ারে নামতে।” কিন্তু নীলা আমল দিল না সে কথা। বললে, “তাঁতিয়া বুড়ো হয়ে গেছে। গায়ে জোর নেই, তাই ওরকম ভয় দেখায়। জোয়ারে না নামলে আবার চান করে আরাম কি, অন্য সময় তো আওরৎ কা মাফিক পানি।” তাছাড়া সে

আমার সমস্ত দায়িত্ব নেবে। একেবারে হাত ধরে থাকবে ইত্যাদি। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে আর সে সময় আমি সমুদ্রে ভাবতেই বেশ এ্যাডভেঞ্চার মনে হল, নীলার কথায় রাজী হয়ে গেলাম।

কদিন থেকেই হোটেলের খাওয়ায় অরুচি জন্মেছে। খাওয়ার কোন অব্যবস্থা ছিল না। সকালে জোড়া ডিমের অমলেট, দুপুরে মুর্গি অথবা পাঁঠার মাংস, মিষ্টি, ফল অর্থাৎ একটু বেশী পয়সা দিলে যে সব বস্তুর বরাদ্দ হয় তার কোনটারই ঘাটতি ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকটি বস্তুর স্বাদ একেবারে অপরিবর্তনীয়। স্বাদেরও যেন এক অলঙ্ঘনীয় রূপ আবিষ্কার করেছে হোটেলের কর্তৃপক্ষ, একটু খারাপ হলেও হয়ত বৈচিত্র্য আসত। কিন্তু প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা ডিশ একেবারে আশ্চর্যরকমের এক, না খুব সুস্বাদু না খুব বিস্বাদ। ক্রমশ অসহ্য লাগছিল। ভাবলাম আগামী কাল বাড়িতেই একটা ফিস্ট করব, সন্ধ্যেবেলাটা অন্তত নিজের মনের মতো খাব।

পূর্ণিমার আগের দিন চাঁদ ভেঙে পড়েছে সমুদ্রের গায়ে। সে আলোয় সমুদ্রের ধারে একলা বেড়াতে বেড়াতে মনে হল সমুদ্রভর্তি সাদা সাদা ঘোড়া একবার করে মাথা তুলছে আর নামাচ্ছে। আরো দূরে জল যেখানে বাইরে থেকে শান্ত সেখানে মাইলের পর মাইল রূপোর পাত ঝলসাচ্ছে আলোয়। আমি সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। সেখানেও আর এক ঢেউয়ের সারি নিঃশব্দে ভেসে চলেছে। ঝাউ বনে বাঁশী বাজছে। বাতাস পড়ে গেলে সমুদ্রের স্বর ছাপিয়ে খেলে বেড়ায় সে তীক্ষ্ণ স্বর।

হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ল। ঠিক খেয়াল নেই আজ কত তারিখ, কি বার। দিন দশ বারো পার হয়ে গেছে নিশ্চয়, পনেরোও

হতে পারে। আমার যে বাড়ি আছে, অফিস আছে, সেখানকার অস্তিত্বটাই যে আমার অস্তিত্ব, এখানে এই বালিতে চাঁদিনীতে অফুরন্ত হাওয়ায় বসে থাকাটা যে নেহাত উপরি ব্যাপার এ কথাটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাওয়ায় উড়ে গেল সে চিন্তা। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হল এইরকম একটা রহস্যময় অনাবিষ্কৃত অস্তিত্ব আমাদের সকলের মধ্যেই আছে তা আমরা কলকাতা কিংবা কমলাপুর যেখানেই যাই না কেন। সে অস্তিত্ব আমরা টের পাই মাঝে মাঝে যেমন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এখন পাচ্ছি। শুনি ভালবাসা হলে ওরকম একটা হয়। অর্থাৎ এমন একটা প্রকাণ্ড যুক্তিহীনতা ভর করে যা তার বিশালতার দাপটে এক রকম দাঁড়িয়ে যায়। আবার এও সত্যি কথা এ যুক্তিহীনতার দাপট অনেক সময় ধোপে টেকে না। আমার এক বন্ধু অকস্মাৎ মাথা মুড়িয়ে সাধু বনেছিল। আবার বছর তিন চার পর নেড়া মাথায় চুল গজিয়ে কেয়ারি করল, চাকরি নিল, শুরু করল ঘর সংসার। সে যুক্তিহীনতা দাঁড় করাতে গেলে অনেকখানি পৌরুষ অনেকখানি শৌর্যের প্রয়োজন। প্রায় ভাস্কোডাগামার মতো এক অনির্নীত দিগন্তসন্ধানে সে যাত্রা। হয়ত এ যাত্রা আরও দুরূহ। কারণ আফ্রিকার দক্ষিণ দিকটা পার হবার রাস্তা সেদিন পর্যন্ত অজানা হলেও প্রকৃতির পরম্পরা দেখে অন্তত একটা আঁচ করা যেত যে হয়ত বাঁক আছে আর বাঁক ঘুরে চললে ডাঙার সন্ধান মিলতে পারে কোন দিন। কিন্তু এই প্রেমের, মৃত্যুর কিংবা প্রকৃতির রহস্য আসে আবার মিলিয়ে যায়, একে মাটিতে ধরে রাখা মুস্কিল। নইলে সোনা তার নতুন জন্মের তীব্রতা ভুলে গিয়ে একেবারে সাদামাটা হবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে কেন, যারা ভালবাসে তাদের এত ভয় কেন তাদের যা দামী তা টিকিয়ে রাখার জন্যে? আর এই যে সমুদ্রের কাছে

এসে আমার মায়া জাগছে ভেবে মানুষের এই বাঁচার আকাঙ্খা এ মায়া কি কোন জোরালো আকর্ষণে দাঁড় করাতে পারব আমার রোজকার অফিসের কিংবা পারিবারিক জীবনে ? এই আকর্ষণ কি আবার অনুভব করব শ্যামবাজারে বালিগঞ্জে ভবানীপুরে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মানুষের মুখের দিকে চেয়ে ?

বালির ওপর চাঁদিনীতে কার ছায়া পড়ল। চমকে চাইতেই দেখি সেই বুড়ি দালদার টিন হাতে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই বললে, "ঐ যে একটা বখা ছোঁড়া এসেছে তোমার বাসায়, ও আমায় ইঁট মেরে ভাগিয়েছে। তুমি চল, আমায় টি পানি দেবে।"

বললাম, "নীলা ফেলে দিয়েছে টি পানি, কাল যখন সকালে চা হবে তখন এসো।"

বুড়ি বাপ তুলে আমায় গাল দিল। একদল কমবয়সী ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে বালিতে নামছিল তারা একবার আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আবার সমুদ্রের তীর ধরে মিলিয়ে গেল। বুড়ি হঠাৎ আমার পাশে বসে পড়ে হাঁউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল। তার কান্নার মধ্যে দিয়ে সে যে কথা বলছিল অসংলগ্ন-ভাবে তা জুড়লে দাঁড়ায়, তার নাতনী তাকে সম্পূর্ণ ঠকিয়েছে, তার গয়নাপত্তর যা ছিল তা সব নাতনীকে দিয়েছিল কিন্তু নাতনী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নইলে কি সে মাংসভাত খেতে পারত না মাঝে মাঝে ? এরকম দালদার টিন হাতে সরাবখানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হত ?

হঠাৎ তীক্ষ্নস্বরে আমায় জিজ্ঞেস করল, "সাদি করেছ ?"

"করি নি, এবার করব।"

"দ্যাখো বাড়িতে সব টাকা দেবে না। বিয়ে করে তো প্রথম

প্রথম সোহাগ হবে খুব। তখন কিন্তু বউকে বলে ফেলো না কত টাকা আছে তোমার। নিজের জন্যে টাকা সরাবে। নইলে বুড়ো হলে আমার মতো টিন হাতে তোমায় দাঁড়াতে হবে।"

আবার সে গালাগালি শুরু করল, তার নাতনীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও। আমি উঠে পড়লাম।

দশ

রাত আর দিন সমুদ্রের ধারে আসে দু ভাবে। তাদের সংঘাত একেবারে বিপরীত। রাত্তিরে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আমার যে অস্থিরতা আসত তা কোন দূরের লোকের। যা আমি চিনি না জানি না অথচ যে অদৃশ্য জগতের জন্যে আমার মন কেমন করে সেই জগত তার শব্দে গন্ধে একটা শারীরিক অস্তিত্ব নিয়ে আমার সামনে হাজির হত। তখন মনে হত সকালবেলা এ সমুদ্রের ধারেই জেলেদের সঙ্গে মাছের ফড়েদের দর কষাকষি, ভেনুগোপালের মন্দিরের সামনে যে সব মেয়েরা আসে জল তুলতে বাদামতলায় তাদের ঠাট্টা আলাপ আর উচ্চকিত হাসি সারা সকাল আমার এত আপনার মনে হয় কেন? এমন-কি ভেনুগোপালের মন্দিরের বাজনাও অনেকখানি মনে করিয়ে দেয় মানুষের জগত। সে জগতে এসে হাজির হয় গামছা কাঁধে পুরুষ্ট চেহারার পূজারী, তার স্থূলাঙ্গিনী স্ত্রী ও একপাল ছেলেমেয়ে। কিন্তু সন্ধ্যের পর যে বাঁশী বেজে ওঠে ঝাউবনে তার এক অন্য চাল, তার পেছনে কোন অনুষঙ্গ নেই মানুষের। সে এক অনির্দিষ্ট শ্যামের বাঁশীর মতো বাজতে থাকে। আমার তখন সন্দেহ হয় আসলে আমরা ভারতীয়রা ইন্দ্রিয়ের বাইরে জগতকে এনে ফেলেই আনন্দ পাই। লোকায়তকে সব সময় এভাবে লোকোত্তরে ঠেলে দেবার চেষ্টা যা আমাদের চিন্তার অনেক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে সে দর্শন থেকে কি কোন মুক্তি নেই?

কিন্তু সকালবেলা তো এরকম মনে হয় না। সূর্য তার উত্তাপে,

সমুদ্র তার সঙ্গীতে, মানুষ তার কলরবে এই আমি নামধেয় জন্তুটিকে তাঁতিয়া, নীলা আর বুড়িটার পাশে এনে দাঁড় করায়। আমি দাঁড়িয়ে থাকি যখন মাছভর্তি নৌকাগুলো ফিরে আসে, হাটের লোক আর জেলেতে সমুদ্রের ধার গিজগিজ করে। মাছের ঝাঁকা নামিয়ে বাজারের ছুঁড়ীগুলো তাদের রুক্ষ চুলে হাত মোছে। তাদের পরনের লাল শাড়ী হাওয়ায় ওড়ে, তাদের হাসি আর আলাপের সাথে সাথে ভেসে আসে দিশী কড়া চুরুটের গন্ধ। আর জেলে নৌকোভর্তি কিম্ভূতকিমাকার মাছ, তাদের কোনটা কেঁচলে, কোনটা নধর ত্যাকতেকে, কোনটার চোখ অস্বাভাবিক জায়গায় বসানো, কাঁটার মতো কারুর লেজ উঁচিয়ে আছে শূন্যে। সেগুলো তীরের ওপর টেনে সার সার দাঁড়িয়ে থাকে নিস্তব্ধ নিস্পন্দ কষ্টি পাথরের মানুষ। মাঝে মাঝে তারা হাসে। তখন কষ্টি পাথরের ভেতরে সাদা দাঁতের পাটি ঝিলিক মেরে ওঠে। তারপর বাহারে আলোয়ান গায়ে, পায়ে জুতো, হাতে ঘড়ি মাছের ফোড়েরা এসে দরদস্তুর করে। এরই মাঝখানে জেলেদের ছেলেগুলো বালি খোঁড়ে, কেউ ডিগবাজি খায়। দূর থেকে ভেনুগোপালের মন্দিরের বাদ্যযন্ত্রটা আওয়াজ করতে থাকে। আর তখন আমার সৌরজগত কোথায় ভেসে যায়।

তখন আমি তাকিয়ে থাকি আমার সামনের শরীরগুলোর দিকে যেখানে নীল শিরাগুলো টান টান হয়ে আছে পরিশ্রমের আনন্দে, অবসাদে। আমার কান খাড়া হয়ে থাকে গলার আওয়াজ শোনবার জন্যে। ভাবতে থাকি মাছগুলো কি করে রাঁধলে স্বাদ হবে। আর সূর্যের আলো ও সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় আমার রক্ত চনমন করে। তখন কোন অনির্দিষ্ট অদৃশ্য কিছুর অস্তিত্ব এতই অপ্রাসঙ্গিক অথবা কাল্পনিক ঠেকে যে সে বিষয় কোন প্রশ্নই জাগে না,। এমনকি

তার প্রতি কোন বিরক্তিও স্থান পায় না চিন্তায়। কোন বিরাটের সাধনা নয়, কোন অতিন্দ্রীয় এ্যাটমের পেছনে ধাওয়া নয়, কোন অনির্নীত আর্টের রহস্য উদ্ঘাটন নয়, এমন কি কোন অমীমাংসিত রাজনীতির অভিযানও নয়, এই সকালবেলার ছবি, এই রক্তমাংসের আনন্দের জন্যে এতগুলো মানুষের সংগ্রাম। এমনকি সাধনাই নয় কেন—এই সাধনাই কি এ পৃথিবীর এত লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন মানুষের, তাদের আরও লক্ষ লক্ষ আশা আকাঙ্খা দুঃখ যন্ত্রণাকে একই সূত্রে মন গাঁথে না? এই কলরবের মাঝখানে বসে মনে হল যদি কোন দেবতাকেই হবিষা অর্পণ করতে হয় তাহলে এই রক্তমাংসের এই মন আর ইন্দ্রিয়ের দেবতাকেই হবিষা অর্পণ করব সন্ধ্যেবেলায় সেই অতিন্দ্রীয় বাঁশী আমি শুনতে চাই না, তাতে আমার মন ভরে না। আমার মন ভরে যখন আমার রক্ত নাচে, যখন আমার অস্তিত্বের সর্বস্ব কাঁদে ব্যথায় আনন্দে।

সমুদ্রের ধার ছেড়ে জোর পায়ে বাজারের দিকে চললাম। একটা মুটে নিলাম বাজারে এসে। নিজে রাঁধব বলে খাসির একটা সেরখানেক রাং কিনলাম। খেয়ে যা বাঁচবে তা নিশ্চয় নীলা সাফ করে দিতে পারবে। এ ছাড়া সের তিনেক চাল, আলু তরিতরকারি নিয়ে বাজারের পেছনেই জেলেদের বস্তিতে তাঁতিয়ার ডেরায় হাজির হলাম। তার খোঁয়াড় তখনও ভাঙে নি। আমায় জড়িয়ে ধরে সে হাঁউমাউ করে কাঁদতে লাগল। আমায় মা বাপ বানালো আর সাথে সাথে ঘোষণা করল যে এত আনন্দ হচ্ছে তার যে সে নির্ঘাত মারা যাবে। তাঁতিয়ার স্ত্রী দেখলাম বেশ শক্ত সমর্থ মেয়ে মানুষ, বোধহয় দ্বিতীয় পক্ষের। লম্বা জোয়ান চেহারা। আমাকে শুনিয়ে ভাঙা হিন্দীতে স্বামীকে ভর্ৎসনা করল। আমাকেও ছাড়ল না

আমার অহেতুক বদান্যতার জন্যে। তারপর তার ছোট ছেলেকে দিয়ে আমায় সেলাম দেওয়ালো। একটুক্ষণ পরে খুব খোলাখুলিই জিজ্ঞেস করল এই খাওয়ানটা বকসিস্ না তাঁতিয়ায় মজুরির মধ্যে। তাকে আশ্বস্ত করায় তার তাজা প্রৌঢ় মুখে চমৎকার হাসি খেলে গেল। আসবার সময় তাঁতিয়া আমায় সাবধান করে দিল তার ভাইপোর সম্পর্কে। বারণ করল আমি যেন তার ফোঁসে পড়ে বেশী দূর না যাই।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর রোস্ট চড়ালাম। লালচে মাংসে ঘিয়ের ছিটে দিতে দিতে গাঢ় বাদামী রং ধরল। দুপুর তখন যায় যায়। সমস্ত ঘর গন্ধে ভুরভুর। সে গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে রাস্তার কতগুলো কুকুর ল্যাজ নাড়তে থাকে গেটের কাছে এসে। দুপুর গড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি যখন রাংটাকে ওলোটপালট করে প্রায় বানিয়ে এনেছি তখন পেছন ফিরে দেখি নীলা অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। সেও ভাগ পাবে বলতে আনন্দে তার চোখ জ্বলে উঠল।

জলে নামলাম দেরি করেই। থালার মতো বিরাট হলদে চাঁদ উঠেছে সমুদ্রের প্রান্তে। দিনের শেষ আলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়ে খালি উঁচু ঢিপির ওপর পুরনো এক মসজিদের গা রাঙিয়ে রেখেছে। বাজারের দিক আবছা অন্ধকারে মেশা। ঝাউবনে বাঁশী বাজা শুরু হয় নি। আমরা পারে এসে খানিকক্ষণ বসে থাকলাম। তারপর কখন দিনের শেষ আলো ছাপিয়ে চাঁদিনী ছড়িয়ে পড়ল লক্ষ্য করি নি। নীলা তার মুখের চুরুটটা ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললে, "চল, চুইম।"

জলে নামতেই টের পেলাম জোয়ার এসেছে। অন্যদিনও নেমেছি জোয়ারে কিন্তু সেদিন জলের তোড় প্রচণ্ড। মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। এক অদৃশ্য দৈত্যের মতো কুস্তিগীর তার অসংখ্য

বাহু আর উরু প্রদেশের ধাক্কায় আমাদের ওলোটপালট করে দিচ্ছে। নীলাও হাঁপাচ্ছে দেখলাম। আমরা একটুক্ষণ থেকেই উঠে পড়লাম। বালিতে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে তাকালাম। মাইলের পর মাইল রূপোর পাত গলে গলে পড়ছে। তীরে কেউ নেই। বিরাট নির্জন বালির চড়ায় একটা কুকুর এসে থমকে দাঁড়াল। একবার ভাবলাম আর নামব কিনা। দিনের বেলা এ সমুদ্রকে অনেক আপনার মনে হয়। অনেকখানি বিশ্বাস করা যায়। যেখানে নেমেছিলাম সেখানটা একেবারে পারের কাছে। দিনের বেলা নিশ্চয় ওখানে দাঁড়িয়ে ঢেউ খেতে লজ্জা হত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঐ সামান্য জায়গাটুকু আরও দূরের যে সব অনির্দিষ্ট জায়গা তরল রূপো হয়ে উঠছে আর পড়ছে সেই বিশালতার সঙ্গে গায়ে গা দিয়ে মিশে আছে। এ জায়গায় নামা মানেই সমুদ্রের বুকের মাঝখানে মিশে যাওয়া। আর সমুদ্রের সেই নীল বুক, তার এখানে সেখানে জেলে ডিঙি, তীরে স্নানার্থীর ছোট ছোট ভিড় সে এক আলাদা জিনিস। সে বুকে ঝাঁপিয়েও ফিরে আসা যায়। আর এই অমানুষিক সৌন্দর্যে ঝলমল করছে যে ব্রোঞ্জের বুক সে বুক পার থেকেই দেখা যায়। এ এক বিশ্রী সর্বনাশা সৌন্দর্য যাকে আপন করা যায় না।

হাওয়ায় ভিজে ঠাণ্ডা লাগে। বুকের কাছে হাত দুটো গুটিয়ে নীলা বললে, "চল, চল,"

"জল বড় ঠাণ্ডা।"

সত্যিই জল ঠাণ্ডা নয় অল্প অল্প গরম। জলে নেমেই সে কথা বলেছিলাম নীলাকে। সে আমার দিকে তাকিয়ে সজোরে হেসে উঠল। বললে, "কেয়া, ডর লাগ গিয়া?"

"দূর! চল যাই।"

জলের আওয়াজ আরও বেড়ে গিয়েছে। ঢেউগুলো নিটোল হয়ে ভাঙছে না। মাঝ পথেই ভেঙে আছড়ে পড়ছে। তার ওপর জলের কোন নির্দিষ্ট গতি নেই। সেবার জল আমাদের বাধা দিয়েছিল এবার জল আমাদের টেনে নিয়ে গেল। পিঠে বুকে উষ্ণ জলের চাপড় দিতে দিতে ফেনায় চোখমুখ ভরিয়ে আমাদের একটানে বেশ কিছুটা নিয়ে গেল। নীলা হাঁক দিল, "হুঁশিয়ার।"

সে হাঁক দেবার কোন দরকার ছিল না। জলের এরকম জোর আমি জীবনে কখনও উপলব্ধি করি নি। এ পানি তো শুধু 'মরদ কা মাফিক' নয় এ এক অমানুষিক হিংস্র পুরুষ, প্রায় এক বিকৃতি। জল পাক খাচ্ছে, কাত হয়ে ঘুরে মুহূর্তে বেসামাল করে দিচ্ছে। একটা বিপদ হতে পারে এই প্রথম টের পেলাম। আমার আত্মবিশ্বাস ছিল, সাঁতারে আমিও কাপ পেয়েছি ছেলেবেলায়। কিন্তু এখানে এই অমানুষিক শক্তির সামনে আমি আর যে কোন আনাড়ীর সমান অবস্থা। নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে হতেই দমে গেলাম। পেছনে একবার তাকালাম। জলের ভেতরে কান ডুবিয়ে যা দেখলাম তাতে মনে হল রূপোলী সৌন্দর্য আমায় গ্রাস করবার জন্যে প্রশান্ত-ভাবে এগিয়ে আসছে। আমাকে সে ধরবেই, টেনে নিয়ে যাবে চাঁদের ঠিক নিচেই সমুদ্র যেখানে উঠছে আর পড়ছে সেই চন্দ্রালোকে কিংবা মৃত্যুলোকে। এ সৌন্দর্য এক দিগন্তব্যাপী বিভীষিকার মতো। এ সৌন্দর্যের চেয়ে যে কোন আশ্রয়ই ভাল। নিমেষের মধ্যে আমার চোখের সামনে খেলে গেল আমাদের বাড়ির পাশেই বস্তি, দরজার জায়গায় চট ঝুলছে হাওয়ায়, ড্রেনে পাঁক জমেছে। সেও ভাল, সেও সহস্রগুণে ভাল। এমনকি কোন ক্ষীণ শীর্ণ গলিতে সন্ধ্যে হতেই যেখানে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় সেইখানে

আমি ফিরে যাব। আর কিচ্ছু না, আমি খালি পায়ের নিচে শক্ত মাটি চাই। প্রতি মুহূর্তে এই যে হাঁপিয়ে উঠছি, যাতে কোন অদৃশ্য হাতে আমায় ঠেলা দিয়ে ফেলে না দেয় তার জন্যে এই প্রাণপণে চেষ্টা করছি তার থেকে বেঁচে যাই। নীলা আবার চীৎকার দিল, "আউর মৎ যানা, ব্যাক মারছে।" এতক্ষণ আমি প্রাণপণে ফিরবার চেষ্টা করছিলাম। যত শক্তি আছে সমস্ত এক করে লড়ছিলাম। কিন্তু আর পারলাম না। একটা প্রবল ব্যাক কারেন্ট এল। আমাকে দোলনার মতো একেবারে পায়ের নিচ থেকে তুলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে দোলনার এমন তীব্র মোহিনী শক্তি যে তখনকার মতো শ্রান্ত না হয়ে পড়লে অন্যসময়ও বোধহয় রুখতে পারতাম না। আর তখন? মনে হল বেঁচে গেলাম। আর এই শক্তিক্ষয়ের লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পারছিলাম না। এবার ভাসলাম। নীলা আবার হাঁক দিল। এবার যেন তার আওয়াজ অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মনে হল। তীরের দিকে তাকালাম। বালি আর ঢেউ এক হয়ে গেছে, তার মাঝখানে একটা কালো বিন্দু। নীলাই বোধ-হয়। আমি তাহলে এতদূর ভেতরে চলে এসেছি। পেছনে কি? অস্ট্রেলিয়া না মৃত্যু? সেই ভয়ানক রহস্য এক প্রশান্ত ব্রোঞ্জের মূর্তি ধরে সহস্র দাঁত বার করে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। তার জয় হয়েছে তাই সে হাসছে। আমি যে একটা পোকা, সেই পোকাকে সে একেবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে। একবার ভাবলাম ভগবানকে স্মরণ করি। কিন্তু মনে হল এই শয়তানটাই তো ভগবান। ভগবান ছাড়া এত বিক্রম কার হবে? তার চেয়ে ......ভাবতে চেষ্টা করলাম আমাদের বাড়ির গলিটার কথা। পার্কের কোণে বকুল গাছ। অফিস থেকে যখন ফিরতাম তখন ফুটপাতে

বিছানো বকুল ফুলগুলো জুতোর তলে চেপ্টে যেত। আর সেই গ্যাসপোস্ট। এমনকি সেই গ্যসপোস্টের সামনের বাড়িটার সিঁড়ি। তিন থাকের মাথায় এসে সিঁড়িটার এক জায়গায় ভেঙে গেছে, ভেতর থেকে ইঁট বেরিয়ে আছে। একেবারে জীবন্ত হয়ে আমার চোখের সামনে দুলতে লাগল গলিটা। হঠাৎ সোনার কথা মনে হল। সোনা একবার বলেছিল না ভেড়ার ল্যাজ খাওয়াবে। মস্ত এক ঢোঁক জল গিললাম। লোনা জল পেটে পড়তে সমস্ত গাটা ঘুলিয়ে উঠল। এতক্ষণ পর্যন্ত মাথা ঠিক ছিল। এখন পর পর লোনা জল খেয়ে চিন্তাশক্তিও লোপ পেল। কতক্ষণ এরকম চলেছিল জানি না। নীলা কখন এসে আমার চুলের মুঠি ধরেছে খেয়াল ছিল না। আমার বিচার শক্তি ফিরে পেলাম নীলার প্রচণ্ড হাঁপানির শব্দে। বুঝলাম সে তার জীবন বিপন্ন করেছে আমার জন্যে। আমি আবার নিজেকে ঝাড়া দেবার চেষ্টা করলাম। এতক্ষণ ভেসে থাকায় হাতের জোর কিছুটা ফিরে এসেছিল। নীলাকে নিশ্চয় স্রোতের উল্টোমুখে আসতে হয়েছে। এই হিংস্র জলের বিরুদ্ধতা করা যে কি তা এ জলে না নামলে কল্পনা করা অসম্ভব। তার চওড়া পাতলা বুকখানা হাঁপাচ্ছে। এক হাতে আমায় ধরে আর এক হাতে ঢেউয়ের সঙ্গে সে মরিয়ার মতো লড়ছে। আমি চিত হয়ে ভাসলাম। একটু দম নিলাম। আমার আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। আর মরিয়া না হয়ে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটতে লাগলাম। অনেকটা কাজ হল। নীলার পরিশ্রমও লাঘব হল অনেকখানি। তারপর কি ভাবে পারের ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে দম ফুরিয়ে তালগোল পাকিয়ে একেবারে আছড়ে পড়লাম বালিতে সে এক অভিজ্ঞতা। পারে এসে বালিতেই মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম। ভগবানকে নয় ধন্যবাদ দিলাম নীলাকে। ছোট ভাইয়ের

মতো বুকে টেনে নিলাম। তার পরিশ্রান্ত আঁশটে গন্ধেভরা বুকখানায় হাত রেখে মনে হল আমি সোনার সেই অতিসাধারণ জীবনের গায়ে হাত রাখলাম। ভাবলাম বাড়ি ফিরেই সোনাকে চিঠি লিখব।

সে রাত্তিরে আর চিঠি লেখা হয় নি। নীলা আর আমি খেলাম একটা ডিস থেকেই। খিদে পেয়েছিল খুব। রান্নাঘরেই বসে পড়লাম। সহরের পাওয়ার হাউসে কি গণ্ডগোল হয়েছে। শুনলাম প্রায়ই হয়। রাত কাটাতে হবে লণ্ঠন জ্বালিয়ে।

রান্নাঘরের ভিতরটার ঠিক নিচেই নীলা পরম তৃপ্তিতে প্রায় চোখ বুঁজে হাড় চিবোচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল সোনা আমার পাশে বসে আছে। আর এমন একটা আনন্দ যা পাওয়া যায় ধরা যায়, তা আমরা দুজনে ভাগ করে নিচ্ছি। সেই যে সে একবার বলেছিল ভেড়ার ল্যাজ খাওয়াবে আমায়। তখন অদ্ভুত লেগেছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারি। এই যে আমরা যেরকম কথা না বলে তর্ক না করে সংশয় সন্দেহে জর্জরিত না হয়ে এই ভোজে মেতে উঠেছি তেমনি এক জীবনের ভোজেই মেতে উঠতে সোনা আমায় ডাক দিয়েছিল। আনন্দকে কোন আকাশচুম্বী অনন্তে ঠেলে না দিয়ে এই রক্তমাংসের রোজকার প্রত্যক্ষ জীবনেই টেনে আনতে বলেছিল সে। এই টানই কি বিরাট ক্ষুদ্রকে, সৎ অসৎকে, সোনা আমি এবং রাস্তার ঘুঁটেওয়ালীটাকেও একটা মোদ্দা অনুভূতির প্রাঙ্গণে দাঁড় করায় না?

ভেতরে ভেতরে আমি এক প্রকাণ্ড অস্থিরতা বোধ করি। এই কদিনে সমুদ্রের ধারের ঘটনাগুলো একে একে ভেসে ওঠে আমার সামনে আর এক রূপ নিয়ে। সোনার বাঁচার সেই উদগ্র আকাঙ্খা আর বুড়িটার লেবুর খোসা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে চিবোনো, তাঁতিয়ার

এক সের চালের ভাত খেয়ে জীবন কাটানোর কি এক গভীর মিল নেই ? সোনা যখন বলত শুধু বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ভালভাবে খেয়ে একটুখানি বাঁচলেই সে বেঁচে যায় আমি তখন তাকে ঠিক মতো বুঝতাম না। কিন্তু তাঁতিয়াকে অথবা এই বুড়িটাকে না বোঝার কোন কারণ নেই। তারা স্পষ্ট পরিস্কার অকাট্য ভাষায় বলছে শুধুমাত্র বাঁচার জন্যেই বাঁচতে চায়। আর সে বাঁচা বেশ মোটা ধরনের। সোনা যখন বলত বেশীর ভাগ মানুষেরই বাঁচার এই মূল লক্ষ্য তখন সে বাঁচার প্রতি তির্যক ভঙ্গীতে তাকাতাম, সেটা কি ঠিক ?

তাঁতিয়া ইংরেজ রাজত্ব চাইলে আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে ইংরেজ রাজত্ব ফিরে এলেও সে এক সের চালের ভাত খেতে পাবে না, তার জন্যে হয়ত অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু সে সব কথা সে বোঝে নি। এমন কি সে সব কথার দিকে কোন ঝোঁকও দেখায় নি, নেহাত মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে কথা তার উৎসাহের কেন্দ্র মোটেই নয়। তার উৎসাহের কেন্দ্র যা তাকে গত ষাট বছর সমুদ্রের বুকে আসামের চা বাগানে বর্মার জঙ্গলে ঘুরিয়েছে তা হল অবিসংবাদিত ভাবে এক সের চালের ভাত। আর তাঁতিয়ার এক সের চালেরই রূপ বদলে যদি দু তিন খানা ঘরের ফ্ল্যাট, কাপড় আর খাওয়া জোটায় এমনি মোটামুটি রোজকার হিসেবে দাঁড় করানো যায় তাহলে তার সঙ্গে রমেনের আমার শ্যামবাবুর সোনার কি এক অচ্ছেদ্য যোগ ধরা পড়ে না ? সেই মোটা সুখই কি আমাদের বাঁচার উৎসাহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় নি ? কয়েকটা লোক বাদ দিলে, কয়েকজন প্রতিভা পাগল বদমাইস কিংবা পঙ্গু মানুষের কথা ভুলে গেলে সেই মোটা সুখই কি আমাদের মতো অসংখ্য মানুষকে তার শক্তিমান সূত্রে বাঁধে নি ?

নিজের চিন্তায় নিজেই চমকে উঠি। এক একবার নীলার দিকে তাকাই। সে পরম নিশ্চিন্তে মাংস চিবোচ্ছে। আমি বাকী মাংসের টুকরোগুলো তার দিকে ঠেলে দিই। সোনা যখন জোরাল ভাবে এই অস্তিত্বের কথা বলেছিল তখন আমি তা মানি নি। এখনও সবটা মানতে মন সরে না। কিন্তু এই নেহাত বাঁচার টান যে এত বড় তা এই সমুদ্রের শব্দ গন্ধ নির্জনতায় প্রথম আবিষ্কার করলাম। এই টান রোজ তীব্রভাবে জানান দেয় যখন সমুদ্র থেকে উঠে শ্রান্ত হয়ে বালির ওপর বুক দিয়ে শুয়ে থাকি, সমস্ত শরীরে উষ্ণ রক্ত দোল খায় আর চোখের সামনে দিয়ে কাঁকড়ার সার বালির ওপর ঘোরাফেরা করেই চকিতে গর্তে ঢুকে পড়ে। সে সময় জলের অবিশ্রান্ত গর্জন কানে নিয়ে কেন বারবার মনে হতে থাকে ঐ বুড়িটার মতো লেবুর খোসা খেয়ে আছড়ে কামড়েনির্লজ্জভাবে বাঁচার ইচ্ছেটাই সবচেয়ে বড় মনুষ্যত্ব। ওরকম কোন উত্তপ্ত রাগিণীতে যদি জীবনখানা বাঁধা যায় তাহলে তার চেয়ে আর কোন বড় কাজ নেই।

তাহলে? নীলা তার অসাধারণ সাধারণত্ব দিয়ে যা করেছে আমি সেই অসামান্য অথচ অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য না করে নিজের বিরাট জিদ বজায় রাখবার জন্যে সরে আসি নি? যেভাবে টাল খেতে খেতে ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে আমি যাচ্ছিলাম সোনাও ঠিক তেমনি ভাবে ভেসে চলেছে। হয়ত তার পাশে এসে দাঁড়োলে, তাকে বুঝতে চেষ্টা করলে সে পারে উঠতে পারে। আমি অস্থির হয়ে উঠি।

নীলা কোন কথা বলে না, কোন প্রশ্ন করে না। তার মাংস চিবোনোর মৃদু আওয়াজ না হলে মনে হচ্ছিল সে ধ্যান করছে।

সে চলে যাবার পরই ঠিক করলাম কাল সকাল আটটার বাস্ ধরব। লণ্ঠনের আলোয় জিনিসপত্র গুছোতে লেগে গেলাম। ময়লা কাপড়

যা ধোবাকে দেব ঠিক করেছিলাম সেগুলো একটা পুঁটলিতে বেঁধে ফেললাম। আর টুকিটাকি যা ছিল স্যুটকেসে ভরে নিলাম। কাল সকালে সময় ছিল। লণ্ঠনের সলতে ছোট হয়ে যাওয়ায় স্যুটকেস সাজাতে অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু আমার আর তর সইছিল না। স্যুটকেস সাজানোর ভেতর দিয়ে আমার সংকল্প যেন দৃঢ় হল। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারলাম।

ঘুম ভাঙলো অচেনা গলার আওয়াজে। নীলা কিংবা তাঁতিয়া বোধ হয় খুব ভোরে এসে চা দিয়ে গেছে। তাতে এক পরত সর পড়েছে। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে সাত। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। বাইরে কে ডাকাডাকি করছে। বেরিয়ে এসে দেখি পোষ্ট অফিসের পিওন। হাতে তার তিনখানা চিঠি।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। নিশ্চয় অফিস থেকে তাড়া দিয়েছে ফিরে আসতে। শ্যামবাবুর কথা মনে পড়ল। আসার সময় বলেছিলেন, "যাচ্ছেন, কিন্তু একেবারে বেপাত্তা হয়ে যাবেন না মশাই। যেরকম অফিসের ব্যাপার। একটু খোঁজখবর দেবেন।" প্রথমে বাবার পোস্টকার্ড। আর দুটো খামে একই হাতের লেখা। কেমন চেনা চেনা ঠেকল। প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপর চমকে উঠলাম। সোনার মায়ের চিঠি।

বাবা তাঁর চিঠিতে জানিয়েছেন যে তিনি পাটনায় এক কাজে গিয়েছিলেন দিন দশেকের জন্যে। ফিরে আসতেই আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে লোক এসেছিল। আমি যে ফটো পছন্দ করেছিলাম সে ছবি যিনি পাঠিয়েছেন বাবা তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন। তার উত্তরে তারা খোঁজ নিতে এসেছিল। আর লিখেছেন আমি যেন একলা সমুদ্রে বেশী দূর না যাই। পুরীতে এরকম একটা খবর তিনি সম্প্রতি

কাগজে পড়েছেন। আমার নামে দুটো চিঠি এসে পড়েছিল। সে দুটো আমার কাছে পাঠালেন।

আমি সোনার মায়ের চিঠি খুললাম। কয়েক লাইন পড়েও ঠিক বুঝলাম না কি ব্যাপার। দ্বিতীয় চিঠিটা খুললাম। আসলে তারিখ হিসেবে দ্বিতীয় চিঠিটাই আগের লেখা। প্রায় দিন সাতেক ব্যবধান। কিন্তু এখন আর সে চিঠির কোন মানে নেই। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দৌড়ে ঘরে এসে খাটের এক কোণায় বসে যে চিঠিটা প্রথমে এসে পড়েছিল সেইটাই সামনে মেলে ধরলাম। চিঠিটার শেষ পর্যন্ত কিছুতেই একসঙ্গে পড়তে পারছিলাম না মনোযোগ দিয়ে। প্রথমটা একটু পড়ছি তারপর নিচে সোনার মায়ের নাম সই দেখছি। আবার মাঝখানটা পড়ছি। এরকম কয়েকবার করার পর স্থির হয়ে চিঠিটা পড়লাম।

"কাল সোনার মৃত্যু হয়েছে। এ কথাটা তোমাকে জানানোর কোন প্রয়োজন নেই জানি। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে তোমায় জানাচ্ছি। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোমায় অভিসম্পাত দেব। তোমায় অভিশাপ দেবার জন্যেই আমি বেঁচে থাকব। এই কথাটা জানাতে তোমায় লিখছি।

গত সাত দিন তোমার কাছ থেকে জবাব পাওয়ার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে কাটিয়েছি। রাত্তিরে মনে হয়েছে পোষ্ট অফিসের পিওন কড়া নাড়ছে। ছিঃ ছিঃ শেষ পর্যন্ত তোমার একটা জিদ সেটাই বড় হল। তোমাকে ভেবেছিলাম একটা মানুষের মতো মানুষ। কেন ভেবেছিলাম ভগবান জানেন। ভেবেছিলাম তোমার নিজের একটা বোধশক্তি আছে, একটু পদার্থ আছে তোমার ভেতরে। তুমি যে

আরো অনেকের মতোই একটা সামান্য পোকা, তা কেন ভাবতে পারি নি। তোমাকে কোন দিন সম্মান করেছি একথা ভেবে আমি লজ্জায় ধিক্কারে মরে যাচ্ছি।

তুমি আমার অভিসম্পাত নাও।"

দ্বিতীয় চিঠিটা আর পড়বার ইচ্ছে ছিল না, অন্যমনস্কভাবে খুললাম।

"তোমাকে আগেও লিখেছি টাকার জন্যে। টাকাটা একান্তভাবে দরকার সোনাকে বাঁচাতে হলে। পরশু ভোর থেকে আবার সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সোনা। আমার আত্মীয়স্বজন সোনাকে হাসপাতালে আমাশার রুগী হিসেবে জেনারেল ওয়ার্ডে চালান দেবার চেষ্টা করছে। আমি জানি তা হলে এখনও যে বাঁচার সম্ভাবনাটুকু আছে তাও যাবে। কিন্তু আমার কোন উপায় নেই। চেয়ে চেয়ে আশেপাশে কারুর কাছে বাদ রাখি নি। গত ক বছর এই ভয়ঙ্কর অসুখের সঙ্গে যুদ্ধে আমি সর্বস্বান্ত। তোমার এ টাকাটা না পেলে সোনাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

কেবল নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। এই তো আমার শরীর, এই কটা হাড় আর রক্ত মাংস। এও যদি বিক্রি করলে টাকা পেতাম তাহলেও দ্বিধা করতাম না। কিন্তু বড্ড বুড়ি হয়ে গেছি যে, নইলে তাও করতাম। তোমার কাছ থেকে সাড়া পাব ভরসা রাখি। তোমায় আমি বিশ্বাস করেছি।"

আমি হতভম্ব হয়ে সুটকেস আর পুঁটলিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে

চেয়ে বাইরে এলাম। আলোয় ঝলমল করছে সমুদ্রের নীল জল। জেলে ডিঙির সারি কালো কালো বিন্দুর মতো জমা হয়ে আছে অনেক দূরে। ছেলেরা লাফ কাটছে বালিতে।

তাঁতিয়া এসে মস্ত সেলাম করল আমায়। খাওয়া দাওয়াটা বোধহয় ভালই হয়েছিল কাল রাত্তিরে। খুব চাঙ্গা লাগছিল তার চেহারা। সমুদ্রের দিকে হাত দেখিয়ে বললে, "বহুৎ আচ্ছা পানি।" নীলাও তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও হেসে আমায় কি বললে, কিন্তু সে কথা আমার কানে গেল না। যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়িয়ে বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ যাব, যাব।"

সমুদ্রের আওয়াজে মনে হল সেদিন জোয়ার আসবে সকাল সকাল। ভেনুগোপালের মন্দিরে বাজনা শুরু হয়েছে। মেয়েরা জল নিতে আসছে বাদামতলায়।

ডিসেম্বর ১৯৫৫—ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬

———